ভে ত রে

... দুর্নীতির পাণ্ডাদের গদিচ্যুত করুন ২
পরিবর্তন কোথায়? ... ৩
এ আই সি সি টি ইউ-র
৮ম সর্বভারতীয় সম্মেলন ... ৪, ৫
সমাজগণতান্ত্রিক আত্মসমর্পণ ৬
বাঁকুড়ার কৃষিমজুর সমিতির সম্মেলন ... ৭

গণদাবী

₹২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ১৮ সংখ্যা ৩৫ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১৩ অক্টোবর ২০১১

নতুন ভূমি অধিগ্রহণ বিল—বহু খানাখন্দ, অনেক সংশয়

অনেক জল ঘোলার পর অবশেষে সংসদে পেশ হল সংশোধিত "ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপন বিল"। এতদিন ১৮৯৪ সালের ঔপনিবেশিক ভূমি অধিগ্রহণ আইনটি দিয়েই সরকার ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সারছিল। বাদ সেধেছে জমি হাতছাড়া করতে অনিচ্ছুক কৃষকদের দেশজোড়া প্রতিরোধ আন্দোলন। উত্তরে ভাট্টা-পারসোল, দাদ্‌রি থেকে দক্ষিণে বেলারি, পশ্চিমে বেলাপুর, পুনে থেকে পূবে কলিঙ্গনগর, নিয়ামগিরি, নন্দীগ্রাম—সর্বত্র একই ছবি। এমনকি লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনগুলোতেও এর ভালই প্রভাব পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের পতন ঘটেছে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরূপ ধাক্কায়। এই পরিপ্রেক্ষিতের ওপর দাঁড়িয়েই সংশোধিত ভূমি অধিগ্রহণ আইনটি এসেছে।

প্রথমে যে খসড়াটি তৈরি হয়েছিল ও গত ২৯ জুলাই প্রকাশ করা হয়েছিল, সেটি সম্পর্কে ইউ পি এ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিক তৃণমূল কংগ্রেস আপত্তি জানায়। তারপরে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ নিজে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কথা বলে তাঁর দাবিমত কিছু সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে নিতে রাজী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ঐকমত্য তৈরি হয়। সবচাইতে মজার ব্যাপার হল, নির্বাচনী বিপর্যয় থেকে কোন শিক্ষাই না নিয়ে বামফ্রন্টভুক্ত বাম দলগুলো, বিশেষ করে সি পি এম কার্যত ১৮৯৪ সালের পুরনো আইনটির সপক্ষেই দাঁড়িয়েছে। তাদের যুক্তি, নতুন আইনে যেহেতু বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য সরকার কর্তৃক মাত্র ২০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের কথা বলা হয়েছে, ফলে জমির মালিকরা ফোড়েদের চক্করে পড়ে ন্যায্য দাম নাও পেতে পারে ও তার দ্বারা বঞ্চিত হতে পারে। প্রসঙ্গত, বনমন্ত্রী হিসাবে জয়রাম রমেশ ওড়িশার পস্কো প্রকল্পের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন, যেখানে আদিবাসী জনগণ ও কৃষকরা আজও মরণপণ প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংশোধিত নতুন বিলের মুখবন্ধে প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "জমির মালিকদের ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ন্যূনতম অসুবিধার সৃষ্টি না করে শিল্পায়ন, অত্যাবশ্যকীয় পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলির বিকাশ এবং শহরায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে একটা মানবিক, অংশগ্রহণমূলক, তথ্যসমৃদ্ধ, আলোচনাভিত্তিক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করা এবং যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে বা প্রস্তাব

সাতের পাতায় দেখুন

প্রশান্ত ভূষণের ওপর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি

এক প্রেস বিবৃতিতে পার্টির রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন, প্রকাশ্য দিবালোকে বিজেপি মদতপুষ্ট ভগৎ সিং ক্রান্তি সেনা নামধারী একদল গুণ্ডা সুপ্রীম কোর্টের বার এ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব কক্ষে প্রশান্ত ভূষণকে যেভাবে আক্রমণ করেছে তা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা ও বিপদজনক প্রবণতা বলে আমরা মনে করি। আদবানীর রথযাত্রা দেশব্যাপী এ ধরনের উস্কানিমূলক হামলায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। প্রশান্ত ভূষণের ওপর হামলাকারীদের এবং তার পিছনের মদতদাতাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, কাশ্মীর প্রশ্নে স্বাধীন কোনও মতামত ব্যক্ত করার কোনও অধিকারই স্বীকার করতে রাজি নয় কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং এই ধরনের হামলাকারীরা। ভারতীয় জনজীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমস্যাগুলোতে নাগরিকদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার দায় নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসনকে।

পলিটবুরোর পর্যালোচনা

১। (ক) বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা আগস্ট

ও অসংগঠিত শ্রমিকদের খাদ্য ও সামাজিক

ইউ পি এ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিক তৃণমূল কংগ্রেস আপত্তি জানায়। তারপরে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমস্যাগুলোতে নাগরিকদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকারকে সুনিশ্চিত করার দায় নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসনকে।

এবং যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে বা প্রস্তাব

সাতের পাতায় দেখুন

পলিটব্যুরোর পর্যালোচনা

(২৮-২৯ সেপ্টেম্বর রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড রাজ্য পার্টি অফিসে পার্টির পলিটব্যুরোর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পাঞ্জাবের প্রখ্যাত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কমরেড গুরুশরণ সিং এবং সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরোর সদস্য ও বর্ষীয়ান সিটু নেতা কমরেড এম কে পান্ধের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিচে দেওয়া হল।)

১। (ক) বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা আগস্ট মাসের প্রচারাভিযানের রিপোর্ট নিয়ে পলিটব্যুরো পর্যালোচনা করে এবং মনে করে যে জেল ভরো ও ছাত্র-যুবদের ব্যারিকেড কর্মসূচীতে যে সাড়া পাওয়া গেছে তা বেশ সন্তোষজনক ও উৎসাহজনক। ৯ থেকে ১২ আগস্ট ছাত্র-যুবদের এই ধরনের ব্যারিকেড কর্মসূচী আমাদের কমরেডদের কাছে এই প্রথম এবং কুড়িটা রাজ্যের ছাত্র-যুবরা এতে অংশ নেন। বিশেষভাবে উল্লেখনীয় ৯ আগস্ট দিল্লীর ছাত্রদের ভালো সংখ্যায় অংশগ্রহণ এবং কার্বি আংলং থেকে আসা কে এস এ, এ আই এস এ এবং আর ওয়াই এ বাহিনীর নজরকাড়া উপস্থিতি। বৃষ্টি ও চাষবাসের ব্যস্ত সময়ের কারণে জেল ভরো কর্মসূচী খুব ভালো হতে পারেনি (মোট সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০) কিন্তু প্রায় সমস্ত রাজ্যে ৬০টির বেশী কেন্দ্রে এই কর্মসূচী রূপায়িত হয়। দীর্ঘদিন বাদে মুম্বাইয়ে আবার পার্টি কাজ শুরু হয়েছে এবং এখানে এক ধর্ণা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) দুর্নীতি, কর্পোরেট লুট ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রচার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অনশন শুরু করার আগেই আন্না হাজারেকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে ১৬ আগস্ট দেশের সর্বত্র মনমোহন সিং-এর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। ২৪ আগস্ট আমাদের ছাত্র সংগঠনের ডাকা ছাত্র ধর্মঘট কয়েকটি স্থানে বিশেষ করে বিহারে ভালো সাড়া পায়। ২৭ আগস্ট দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিহারে আমাদের গণসংগঠনগুলো বিহার বন্ধ সংগঠিত করে এবং কৃষি মজুর সংগঠন ইন্দিরা আবাস প্রকল্প রূপায়ণে ব্যাপক অনিয়মের বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যে ব্লক স্তরে বিক্ষোভ সংগঠিত করে। ২৭ সেপ্টেম্বর রাঁচিতে জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন বিল ২০১১-র বিরুদ্ধে সারা ভারত কিষাণ মহাসভা এক জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত করে।

(গ) ইউ পি এ সরকারের ভাবমূর্তি দিন দিন আরও সংকটের মধ্যে পড়ছে। স্পেক্ট্রাম দুর্নীতিতে পি চিদাম্বরমের জড়িত থাকার সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করে অর্থমন্ত্রকের একটি নোট প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে অর্থমন্ত্রী ব্যাখ্যা দেন যে এই নোট প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রকগুলোর মধ্যকার ব্যাকগ্রাউণ্ড নোট যেখানে আইনমন্ত্রক ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পাঠানো তথ্যাবলীও আছে। অবশ্য অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে এই নোটের মতামত তাঁর নিজস্ব মতামত নয়। এ সমস্ত কিছুই দুর্নীতির ঘটনায় এবং তা চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টায় সমগ্র সরকারেরই জড়িত থাকাকে উন্মোচিত করছে। ইউ পি এ সরকারের ক্রমবর্ধমান সংকটকে পুঁজি করতে বিজেপি উঠেপড়ে লেগেছে, যদিও অবশ্য পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর প্রশ্নে তাদের পার্টি এবং এন ডি এ অভ্যন্তরীণ বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। মনমোহন সিং ও তার মন্ত্রীসভার পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার থাকার সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই দুর্নীতি বিরোধী কার্ড খেলতে দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপির হাস্যকর চেষ্টাকে দৃঢ়তার সঙ্গে উন্মোচিত করতে হবে। আদবানী বিহার থেকে তার যাত্রা শুরু করার জন্য জয়প্রকাশের জন্মবার্ষিকী ও তার জন্মস্থানকে বেছে নিয়েছেন। কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করতে বিজেপি ১৯৭৪ সালের উত্তরাধিকার ও বিহারের লড়াকু ক্ষেত্রকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ছাত্র-যুব কমরেডদের অবশ্যই বিজেপির এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টাকে উন্মোচিত করতে ও চ্যালেঞ্জ জানাতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তার যাত্রাপথের সর্বত্রই এই রথযাত্রাকে রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত করতে হবে।

(ঘ) দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনে, বিশেষ করে গ্রামোন্নয়ন তহবিলের তছরূপ ও লুটের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীন হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি-বিরোধী সংগ্রামকে উদারনীতিকরণ ও বেসরকারীকরণের নীতির বিরোধিতার অভিমুখে চালনা করতে আমাদের জোরালো ও অটল প্রয়াস (কেননা এই নীতিই কর্পোরেট লুটকে উৎসাহিত করছে ও বড় বড় দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে) এবং একই সাথে ইউ পি এ এবং এন ডি এ উভয় সরকার এবং অন্যান্য রাজ্য সরকার, যারা কম দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় সংগ্রাম—এসব কিছু ব্যাপক বাম ও গণতান্ত্রিক মহলের প্রশংসা অর্জন করেছে। ইউ পি এ, এন ডি এ এবং অন্যান্য কলঙ্কিত রাজ্য সরকারকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে এবং আজকের বুনিয়াদী ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে অবশ্যই আমাদের প্রচেষ্টাকে জোরালো করে তুলতে হবে। "দুর্নীতির মোকাবিলা করুন, গণতন্ত্রকে রক্ষা করুন"—এই হল আজকের পর্যায়ের কেন্দ্রীয় শ্লোগান। কিন্তু আমাদের অবশ্যই আজকের সময়কালের সমস্ত বড় বড় ইস্যুতে যথাযথ নজর দিতে হবে; লড়াই গড়ে তুলতে হবে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ও ভূমি সংস্কারের পক্ষে, মূল মূল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র ও প্রাকৃতিক সম্পদের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ ও অসংগঠিত শ্রমিকদের খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার দাবিতে, কাজের অধিকারকে এক মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোখার দাবিতে, সমস্ত শ্রমজীবী ও অল্প আয় করেন এমন মানুষদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বি পি এল তালিকাভুক্ত করার দাবিতে এবং জনগণ যাতে ভর্তুকিপ্রাপ্ত মূল্যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে পারে তার জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থার সার্বিকীকরণের দাবিতে।

২। এ আই সি সি টি ইউ এবং এ আই এ এল এ-র সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি রিপোর্ট নিয়ে পলিটব্যুরো আলোচনা করে। উভয় সম্মেলনই নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় এ আই এ এল এ-র চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিহার রাজ্য কমিটি ২১ নভেম্বর পাটনায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত করবে। এই সম্মেলন দুটিকে বিরাটভাবে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পলিটব্যুরো সমস্ত পার্টি কমিটির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

৩। এ আই এল সি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলো নিয়ে পলিটব্যুরো আলোচনা করে। ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এ আই এল সি-র ব্যানারে এক ছাপ ফেলার মতো কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অনেক বামপন্থী গ্রুপ ও লোকজন উপস্থিত হন। আর একটা কনভেনশন ১০-১১ অক্টোবর জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হবে। সি পি এমের সংকট গভীরতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে সি পি আই (এম)-এর মোহমুক্ত কর্মীবাহিনী ও বৃহত্তর বাম শিবিরের শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছাতে আমাদের অবশ্যই সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ও ঐক্যের দিকগুলো খুঁজতে হবে। অবশ্য সম্ভাবনা দেখা দিলে সি পি আই (এম), সি পি আই বা ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-র সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক যৌথ কার্যকলাপ চালানোর যে প্রতিষ্ঠিত কর্মনীতি আমাদের রয়েছে তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে না।

ইউ পি এ-র দুর্নীতির পাণ্ডাদের গদীচ্যুত করুন, এন ডি এ-র মুখোশধারীদের মুখোশ খুলে দিন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্রতর করে তুলুন

অর্থমন্ত্রক ২০১১-র ১৫ মার্চ যে নোট পাঠায় এবং যাতে ২ জি দুর্নীতিকে না থামানোর জন্য পূর্বতন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে দায়ী করা হয়, অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী সেই নোট থেকে নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরিয়ে নেওয়ায় চিদাম্বরম গোটা ব্যাপারটাকেই এক সমাপ্ত অধ্যায় বলেছেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রকের নোট এবং পরবর্তীকালে প্রণব মুখার্জীর ব্যাখ্যা চিদাম্বরমের শাস্তিযোগ্যতাকেই শুধু স্পষ্ট করে তোলেনি, ঐ দুর্নীতিতে এবং পরবর্তীতে ধামাচাপা দেওয়ার যে প্রচেষ্টাগুলো নেওয়া হয় তাতে গোটা সরকারের যোগসাজশকেও উন্মোচিত করে দিয়েছে। প্রণব মুখার্জী তাঁর মন্ত্রকের নোটকে আইন মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে আলোচনার জন্য তৈরী একটি পেপার বলে বর্ণনা করেছেন। এর সঙ্গে তিনি অবশ্য বলেছেন যে, ঐ নোটে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে তার সবগুলোর সঙ্গে তিনি ঐক্যমত পোষণ করেন না।

ইউ পি এ-র মন্ত্রীরা জানেন, তাঁদের এক সঙ্গেই বাঁচতে হবে বা ডুবতে হবে। আর তাই এটা বুঝে ওঠা একটুও কঠিন নয় যে, কিভাবে মুখার্জী ও চিদাম্বরম উভয়ের কাছেই রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার সহজাত প্রবৃত্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল এবং তাঁরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতিতে পৌঁছালেন। তবে অর্থমন্ত্রী অর্থ মন্ত্রকের নোটের কয়েকটি পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেই ঐ নোট কিন্তু হাওয়ায় মিলিয়ে যায় না। যেদিন থেকে ২ জি দুর্নীতির উন্মোচন ঘটতে লাগল, সংসদীয় শাসনধারার সঙ্গে এটাও দুর্নীতির ইউ পি এ নায়কদের তাদের অপরাধ থেকে রেহাই দেয় না। একথা সত্যি যে, দুর্নীতিগুলোর মূল নিহিত রয়েছে ১৯৯১ থেকে একের পর এক সরকার যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে তার মধ্যে, যেগুলোর উৎস আবার রয়েছে উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণের নীতিগুলোর সূচনার মধ্যে, সেগুলোকে চালু করেন আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের বেছে নেওয়া এক অর্থমন্ত্রী যিনি আবার আজকের প্রধানমন্ত্রী!

ইউ পি এ শাসনের অধীনে জিনিসপত্রের মূল্য যখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং দুর্নীতির সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে, বিজেপি তখন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। ২০০২-এর গুজরাট গণহত্যার পরিচালক নরেন্দ্র মোদি এখন যেখানে 'সদ্‌ভাবনা কর্মসূচীর' কথা বলছেন, আদবানী তখন বলছেন 'পরিচ্ছন্ন রাজনীতির' কথা, যদিও বিরাট আকারের কেলেঙ্কারির উন্মোচনের জন্য বিজেপির দু-জন মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। আদবানী তাঁর ১৯৯০-এর কুখ্যাত রথযাত্রার ২১তম বার্ষিকীতে সোমনাথ পরিদর্শন না করায় এবং মোদি আদবানীর আসন্ন রথযাত্রাকে এক বৃথা প্রচেষ্টা বলায় প্রচার মাধ্যমে বিজেপির অভ্যন্তরে মোদি ও আদবানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে ওঠা নিয়ে কাহিনীর অভাব নেই! সে যাই হোক, 'স্বচ্ছ রাজনীতি' নিয়ে আদবানীর বাগাড়ম্বর আর 'সদভাবনা' নিয়ে মোদির হালফিলের বাগাড়ম্বর, দুটোই সমানভাবে মেকি এবং ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে বিজেপি এবং এন ডি এ-কে কোন রেয়াত করলে চলবে না, তাতে যে বিজেপি নেতা যে

সম্পাদকীয়

জঙ্গলমহলের মঙ্গল দূর অস্ত্

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা সফরে বেরিয়েছেন। প্রথম গন্তব্য পাহাড়। জি টি এ চুক্তির পর আপাতত বেশ রসেবশেই কাটছে তৃণমূল-জনমুক্তি মোর্চা মধুচন্দ্রিমা। নিজেদের অধিকারের গ্যারান্টি না পেয়ে সমতলের আদিবাসীরা না-খুশ জি টি এ নিয়ে। তারা স্বতন্ত্র আদিবাসী স্বশাসিত পরিষদ দাবি করেছে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পাহাড়ে। তাই হাজার কোটি টাকা ত্রাণের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতৃবৃন্দ। রাজ্য সরকারের ভাঁড়ে মা ভবানি! মিলেছে রাস্তা মেরামত, পানীয় জল ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন বাবদ ২০ কোটি, মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের থেকে দুটি স্কুলের জন্য ৫০ লক্ষ এবং ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়ার জন্য ৪৯৫ কোটি টাকা চেয়ে কেন্দ্রের কাছে চিঠি। এত সব সত্ত্বেও গোর্খাল্যাণ্ডের দাবি থেকে যে মোর্চা সরছে না তার আভাসও তারা দিয়েছে। সুতরাং পাহাড়ে বারুদের মশলা যথেষ্টই মজুত।

পাহাড়ের পর জঙ্গলের পালা। পরের গন্তব্য জঙ্গলমহল। ১৫ অক্টোবর জঙ্গলমহল পৌঁছচ্ছেন মমতা। মমতার সফরের আগেই রাজ্য সরকার যে বার্তাটা জঙ্গলমহলের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট হয়েছে তাঁর সফরের ঠিক আগেই গত ৮ তারিখ পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ভাগবত হাঁসদার আকস্মিক গ্রেপ্তারের মধ্যে দিয়ে। মিথ্যা খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে ভাগবতের বিরুদ্ধে। আসলে ভাগবত ঝাড়গ্রাম-বিনপুর অঞ্চলের দক্ষ শ্রমিক সংগঠক ও গণআন্দোলনের নেতা। স্থানীয় স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলির এবং এম পি এস ফুড প্রোডাক্টস্-এর শ্রমিকদের বঞ্চনা ও অধিকার হরণের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি সরব ও সক্রিয়। ছত্রধর মাহাতোর সপক্ষে নির্বাচনী প্রচারেও তিনি যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফলে তিনি যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের ও তাদের পৃষ্ঠপোষক শিল্পমালিকদের চক্ষুশূল হবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? ভাগবতের গ্রেপ্তারের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকার বোঝাতে চেয়েছে, জঙ্গলমহলে পুলিশী রাজ চলছে এবং চলবেও।

নইলে মেয়াদ ফুরোনোর পরেও এক ব্যাটেলিয়ন আধা-সামরিক সেনা জোর করে কেন রেখে দেবে রাজ্য সরকার? নির্বাচনের আগে মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেছিলেন, ক্ষমতায় এলেই তুড়িতে সমাধান করে দেবেন জঙ্গলমহলের সমস্যা। এখন বোধহয় তিনি বুঝতে পেরেছেন, সমস্যা অনেক গভীরে। ক্ষমতায় বসেই তিনি জঙ্গলমহলকে প্রথমেই যে জিনিসটা উপহার দিয়েছেন সেটা হল, ছত্রধর মাহাতোর নির্বাচনী এজেন্ট মনোজ মাহাতোকে বহু পুরনো অভিযোগে গ্রেপ্তার করা। আর দ্বিতীয় উপহারটা হল, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসা। তৃতীয় উপহার, যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের নামগন্ধ না করা, বরং তার অত্যাচার আরও বাড়িয়ে তোলা। চতুর্থ উপহারটি আরও বিচিত্র—জঙ্গমহলের 'বাম' সন্ত্রাস উপদ্রুত অঞ্চ লগুলিতে বসবাসকারী ১০,০০০ যুবককে পুলিশে চাকরি দেওয়া। ততদিনে অবশ্য অঞ্চলের মানুষ এই উপহারের পিছনকার মতলবটা ধরে ফেলেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, বকলমে এখানে একটা সরকারি সালওয়া জুডুম গড়ে তোলার চক্রান্ত হচ্ছে। তাই আজ পর্যন্ত কেউই এই টোপ গেলেনি। পুলিশী রাজের আর এক নমুনা পঞ্চ ম উপহারটি। গোটা এলাকার সব মানুষকে বি পি এল বলে ঘোষণা করে ২ টাকা কেজি দরে চাল-গম নিতে আহ্বান করা হচ্ছে পুলিশ থানা থেকে। কে কবে শুনেছে, থানা থেকে

তবে অর্থমন্ত্রী অর্থ মন্ত্রকের নোটের কয়েকটি পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেই ঐ নোট কিন্তু হাওয়ায় মিলিয়ে যায় না। যেদিন থেকে ২ জি দুর্নীতির উন্মোচন ঘটতে লাগল, সংসদীয় শাসনধারার সঙ্গে পরিচিত যে কোন ব্যক্তি সেদিন থেকেই আঁচ করতে পারলেন যে, ঐ রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্ষেত্রে এত বড় বড় খেলোয়াড়দের জড়িয়ে এত বড় মাত্রার একটা দুর্নীতি শুধু টেলিকম মন্ত্রীর বেনিয়ম কাজের জন্যই ঘটতে পারে না। এটা 'যৌথ দায়িত্ব'র ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়, যে মূল নীতিটাকে সংসদীয় গণতন্ত্রের সরকারগুলো প্রায়শই তুলে ধরে থাকে।

মনমোহন সিং খুব ভাল করেই জানতেন যে, কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিলে তা এক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে। আর তাই তিনি এ রাজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যতটা দেরী করা সম্ভব ততটাই করলেন। রাজা এখন জেলে এবং টেলিকম মন্ত্রকে তাঁর পূর্বসুরী দয়ানিধি মারানও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন, এই অবস্থায় প্রণব মুখার্জী তাঁর 'সম্মানীয় সহকর্মী' চিদাম্বরমের সমর্থনে যাই বলুন না কেন, আমরা সবাই খুব ভালভাবেই জানি যে, এ রাজাও কিন্তু জোর দিয়ে বলছেন যে, স্বাক্ষ্য দেওয়ার জন্য চিদাম্বরমকে ডাকতে হবে! মনমোহন সিং ও তাঁর মন্ত্রীরা এখন নিজেদের চামড়া বাঁচানোর জন্য সমস্ত নিয়মেরই বিকৃত ব্যাখ্যা হাজির করতে এবং সমস্ত সৌজন্যবোধকেই অবজ্ঞা করতে পারেন। তবে জনগণের উপলব্ধির কথা যদি বলা যায়, ২ জি দুর্নীতিতে কংগ্রেস দল এবং ইউ পি এ সরকারকে জড়িয়ে নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা তাদের মধ্যে চলতেই থাকবে।

বড় বড় যে দুর্নীতিগুলো কংগ্রেস/ইউ পি এ শাসনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে, তার থেকে নিজেদের মুক্ত করার কোন ওজরই তাদের নেই। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, ক্যাগ-এর আনুমানিক হিসেব ক্ষতির পরিমাণকে বাড়িয়ে দেখেছে। যেন, ক্ষতির পরিমাণকে যদি ১৭৬০০০ কোটি টাকা না হয়ে ৭৬০০০ কোটি টাকা বলা হত, তাতে বুঝি অপরাধটা খাটো হয়ে যেত! কখনও কখনও তাঁরা এও বলেন, তাঁদের পূর্বসুরীরা যে নীতি চালু করে তাঁরা সেগুলোকেই অনুসরণ করেছেন। 'সদভাবনা' নিয়ে মোদির হালফিলের বাগাড়ম্বর, দুটোই সমানভাবে মেকি এবং ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে বিজেপি এবং এন ডি এ-কে কোন রেয়াত করলে চলবে না, তাতে যে বিজেপি নেতা যে ধরনের মুখোশই পরুক না কেন!

এটা ইতিহাসের একটা পরিহাস যে, আদবানী ১৯৯০ সালে গুজরাট থেকে তাঁর রথযাত্রা শুরু করেন, আর তাঁর রথকে অবশেষে থামানো হয় বিহারে। দু-দশক পর আদবানী তাঁর এবারের রথযাত্রা শুরু করবেন বিহার থেকে, যার আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটাবেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এ হল রাজনৈতিক সুবিধাদের চমকপ্রদ সম্মিলন—আদবানী যখন জয়প্রকাশের জন্মদিনে তাঁরই জন্মস্থল থেকে তাঁর রথযাত্রা শুরু করে জয়প্রকাশ নারায়ণের উত্তরাধিকারকে আত্মসাৎ করতে চাইছেন, নীতীশ কুমার তখন এর মধ্যে নিজেকে এক দুর্নীতি-বিরোধী যোদ্ধা হিসেবে তুলে ধরা এবং এন ডি এ-র মধ্যে তাঁর ব্র্যাণ্ডের মূল্যকে বাড়িয়ে তোলার সুযোগ দেখছেন।

এটা ১৯৭৪-এর জয়প্রকাশের আন্দোলনের এক সার্বিক প্রহসন এবং ভারতীয় জনগণের চলমান দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনের স্পিরিটের প্রতি অবমাননা। জয়প্রকাশের আন্দোলন দুর্নীতিপরায়ণদের গদিচ্যুত করতে চেয়েছিল এবং একদল দুর্নীতিপরায়ণদের সরিয়ে তার স্থানে আর এক দল দুর্নীতিপরায়ণদের আনা ঐ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল না। আর আদবানীর 'স্বচ্ছ রাজনীতি'র সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে নীতীশ কুমারকে বিহার ও ভারতের জনগণের কাছে তাঁর নিজের সরকারের সততার প্রমাণপত্র হাজির করতে হবে। ট্রেজারি জালিয়াতি ১৬০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে এবং বি আই এ ডি এ জমি বিতরণ কেলেঙ্কারি জানান দিচ্ছে যে, নীতীশ কুমারের শাসনাধীনে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ কি মাত্রায় চলছে।

ইউ পি এ-র দুর্নীতির পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে তীব্রতর করে তোলার সাথে সাথে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় যোদ্ধাদের বিজেপি-এন ডি এ-র ভড়ং ও কপটতার রাজনীতিকে যথাযোগ্য ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

(এম-এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৪ অক্টোবর ২০১১)

মানুষ এই উপহারের পিছনকার মতলবটা ধরে ফেলেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, বকলমে এখানে একটা সরকারি সালওয়া জুডুম গড়ে তোলার চক্রান্ত হচ্ছে। তাই আজ পর্যন্ত কেউই এই টোপ গেলেনি। পুলিশী রাজের আর এক নমুনা পঞ্চম উপহারটি। গোটা এলাকার সব মানুষকে বি পি এল বলে ঘোষণা করে ২ টাকা কেজি দরে চাল-গম নিতে আহ্বান করা হচ্ছে পুলিশ থানা থেকে। কে কবে শুনেছে, থানা থেকে রেশন বিলি হয়? হ্যাঁ, হয়, তবে সেটা সেনা শাসনে।

সেই বামফ্রন্ট রাজত্ব থেকে জঙ্গলমহলে পূর্বাপর কার্যত এক সেনা শাসনই চলছে। এলাকার মানুষ ভেবেছিল 'পরিবর্তন' এলে এলাকায় শান্তি ফিরবে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! সি পি এমের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর জায়গা নিয়েছে তৃণমূলের ভৈরব বাহিনী। আরও যেন আঁটোসাটো হয়েছে যৌথবাহিনীর কব্জা। নির্বিচার ধরপাকড়, অত্যাচার চলছে নিরীহ আদিবাসী মানুষদের ওপর। এক দৈনন্দিন সন্ত্রাসের পরিবেশের মধ্যেই বাস করছে জঙ্গলমহল। যৌথবাহিনীর সাঁড়াশি চাপে মাওবাদীরাও আপাতত রক্ষণাত্মক। অথচ নির্বাচনের আগে মাওবাদী পলিটব্যুরো নেতা কিষেণজী সংবাদমাধ্যমের সামনে খোলাখুলি বলেছিলেন, মমতা ব্যানার্জীকে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয়েছে, তবু তাঁদের এখন বলতে হচ্ছে, মমতা ব্যানার্জী তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেননি? তাঁরা যদি মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র বুঝতে ভুল করে থাকেন, তবে তার খেসারত তো তাঁদের দিতেই হবে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে মধ্যস্থতাকারীদের এক নাটক। মাওবাদীদের আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার জন্য তাঁদের তৎপরতার শেষ নেই। সম্প্রতি মাওবাদী নেতা আকাশের সই সম্বলিত তথাকথিত এক অস্ত্রসম্বরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে খুব হৈ চৈ শুরু হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। রাজ্য সরকার তাকে কোন আমল দেওয়ারই প্রয়োজন দেখাচ্ছে না। মধ্যস্থতাকারীদের 'না ঘাটকা, না ঘরকা' দশা। পিং পং বলের মত তাঁরা একবার মাওবাদীদের কাছে দৌঁড়চ্ছেন, আর একবার রাইটার্সে এসে দরবার করছেন।

এরই মাঝে মুখ্যমন্ত্রীর জঙ্গলমহল সফর। প্রশাসনে সাজো সাজো রব। ঝাড়গ্রামে জনসভা হবে, নয়াগ্রামে সেতুর শিলান্যাস। সফর শেষে আমরা হয়তো আরও কিছু জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি শুনব, হয়তো বা লোকদেখানো এক ব্যাটেলিয়ন আধা-সামরিক বাহিনী সরানোর ঘোষণাও। কিন্তু জঙ্গলমহল যে তিমিরে ছিল, আপাতত থাকবে সেই তিমিরেই!

বাটায় সংহতি মিছিল

বাটা কারখানায় যখন বছরে বছরে মুনাফার পাহাড় জমছে, শেয়ার হোল্ডাররা ডিভিডেন্ট বেশী পাচ্ছে এবং বাৎসরিক টার্ণওভার বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সময় এই শিল্পকে রুগ্ন দেখিয়ে বাটা শিল্পকে চাঙ্গা করার নামে বাম সরকার ৩০০ কোটিরও বেশি দামের ২৬২ একর জমি মাত্র ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকায় বাটা কোম্পানীর হাতে ন্যাস্ত করে দেয় বিত্তবানদের জন্য আবাসন ও প্রমোদ নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে।

বাটা নগরে যে নির্মাণ কাজ চলছে, সেখানে জারি এক মধ্যযুগীয় শোষণ। শ্রমদিবসের কোন নিয়ম কানুন মানা হয় না। দিনে ১২ ঘন্টাও খাটানো হয়, সপ্তাহে কোন ছুটি নেই। লেবার কনট্রাক্টারের মত মধ্যযুগীয়, মধ্যসত্ব ভোগীর হাতে লেবারদের ভবিষ্যত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোন রেজিস্টার রাখা হয় না। অ্যাম্বুলেন্স সহ ২৪ ঘন্টা চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, আঘাতপ্রবণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তা জনিত সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় না। কোনরকম দাবি করলেই লেবার কনট্রাক্টরদের মাধ্যমে দূর-দূরান্ত থেকে আসা অসংগঠিত শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার ভয়

তিনের পাতায় দেখুন

পরিবর্তন কোথায় ?

'পরিবর্তন' আর 'মা-মাটি-মানুষের' নামে তৃণমূল কংগ্রেস গত বিধানসভা নির্বাচনে হরেক প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। এই আলোচনা তার নির্দিষ্টভাবে 'কৃষি ও জমি' সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয়ে। ইতিমধ্যে মমতা সরকারের চলতি আর্থিক বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়ে দেওয়া সারা। মুখ্যমন্ত্রী সময় নির্ধারিত হাতে নেওয়া কাজের নববই শতাংশ সাফল্যের খতিয়ান প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এখন দেখা যাক, ঐ কৃষি আর জমির প্রশ্নে কথা আর কাজের মধ্যেকার সম্পর্কটা ঠিক কোন্ খাতে চলছে।

নির্বাচনী ইস্তাহারে তৃণমূল বলেছিল— (১) 'কৃষি নির্ভর জনগণের নিরাপত্তা বাড়ানো দরকার' (পৃঃ ১৪)। (২) 'ভাগচাষিদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে'। (৩) 'ছোট এবং প্রান্তিক চাষিদের মালিকানার বিষয়কে কার্যকরি করতে হবে', (পৃঃ ১৫)। (৪) 'অসম্পূর্ণ ভূমিসংস্কারের কাজকে সম্পূর্ণ করা এবং ভূমিহীনদের জমি দেওয়া'। (৫) '... কৃষি, অকৃষি, অরণ্য, জল ও পতিত ভূমির বিস্তারিত মানচিত্র তৈরী করতে হবে এবং তা পঞ্চায়েত সমতি স্তরে হবে'। (৬) '১৮৯৪ সালের দানবীয় জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী মা-মাটি-মানুষের সরকার কোথাও এক কাঠা জমি নেবে না। পশ্চিমবঙ্গে 'সেজ' চলবে না। নতুন কৃষিজমি নীতি তৈরী হবে'। (৭) '... ভাগচাষি আছে এমন জমির মালিক জমি বিক্রয় করলে ভাগচাষিদের স্বার্থ সুরক্ষিত করে জমি ক্রয় করা হবে'। (পৃঃ ১৬)। (৮) 'বিপুল পরিমাণ জমি সংক্রান্ত মামলা বছরের পর বছর ঝুলে আছে। ... এগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে'। (৯) 'চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শারীরিকভাবে অক্ষম জমির মালিকের ... চাষ জমি সাধারণভাবে পতিত থাকে। ... বর্গা রেকর্ডের ভয়ে জমির মালিক জমি ফেলে রাখেন, কিন্তু অন্য কাউকে চাষ করতে দিতে চান না। এই ধরনের পতিত জমিকে জমির মালিকানা ও স্বত্ব অবিকৃত রেখে চাষ করতে ইচ্ছুক এমন

ব্যবহার সংক্রান্ত তাঁর কোন বিশেষজ্ঞ রেকর্ড রয়েছে কিনা সেকথা তিনি এবং তাঁকে যে নিয়োগ করেছে সেই মমতা সরকারই একমাত্র বলতে পারে। বাকীরা অন্ধকারে। যাই হোক, ঐ কমিটি কিন্তু কেবল জমি ব্যবহারের নীতিকথায় সীমিত থাকেনি, সীমানা ছাড়িয়ে আরও অনেক মন্তব্য করেছে; এমনকি কথাপ্রসঙ্গে, বাস্তবত গরিব ও ভূমিহীন কৃষক জনতা যা সংঘটিত করেছিল সেই '৬০-'৭০ দশকের জমি দখল আন্দোলনকে 'জমি ডাকাতি' বলতে ছাড়েননি। বোধ হয় এই কারণেই যে, তখনকার যা কিছু বেনামী জমি উদ্ধার ও খাস জমি দখল আন্দোলন, বর্গা অধিকার কায়েমের আন্দোলন, সবই হয়েছিল কোথাও সংগঠিতভাবে-কোথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জঙ্গী ও বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের উত্তাল সময়ে। বামফ্রন্ট জমানার কৃষক বিরোধী জমি আগ্রাসন নীতির বিরোধিতা করতে করতে, এমনকি '৬০-'৭০ দশকের উত্তাল বিপ্লবী কৃষক জাগরণের সময়কার কৃষকদেরই দ্বারা জমি দখল আন্দোলনের উগ্র কুৎসায় প্রমত্ত হলেন মমতার তৈরী কমিটিবাবুরা। আর তার সাথে তৃণমূলের প্রতি তাদের বিগলিত তোষণ মনস্কতাই ঐ কমিটিবাবুদের মুখ্যমন্ত্রীর মনোমত গরলামৃত কারণসুধা বানাতে প্ররোচিত করেছে। মাত্র একপক্ষকালের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার বহর দেখিয়ে দেয় তলে তলে প্রস্তুতিটা অনেক আগেই শুরু করে দেওয়া হয়েছিল। রিপোর্ট অনেক কথাই লিখেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের জমিনীতির 'ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট', 'জমি নীতি-জমি অধিগ্রহণ (সিঙ্গুর পরিদৃশ্য)', 'জমি অধিগ্রহণ আইন সম্পর্কে সাধারণ নীতি', 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল', 'জমির ঊর্ধবসীমা সংক্রান্ত বিষয়াদি', 'বাস্তুজমির অধিকারের নিরাপত্তা', 'বর্গাদারী ব্যবস্থা', 'আদিবাসীদের নিজেদের জমির সুরক্ষা', 'জমি ব্যবহারের মানচিত্র', 'জমি ব্যাঙ্ক', 'চুক্তি চাষ'; এরকম আরও কিছু বিষয়ে বক্তব্য ও সুপারিশ করেছে 'বন্দ্যোপাধ্যায়-বোস কমিটি'।

তাদের তৈরী খসড়া প্রস্তাব বেশ কিছু খাস প্রশ্নে যথেষ্ট গোলগোল কথা আউড়ে গেছে। নতুন সরকার এসেছে খুব বেশীদিন হয়নি, এখনই কৃষি ও জমি প্রশ্নে বড় কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। তাই সরকারের তৈরী কমিটি যেমন সমীক্ষার জন্য ছকে দেওয়া নির্দিষ্ট বিষয়টির পরিসীমা ছাড়িয়ে গেছে, তেমনি অধিকাংশ প্রসঙ্গেই বিমূর্ততার কৌশলগত অবস্থান বিবৃত করার সুযোগ নিয়েছে। কোথাও কোনও নির্দিষ্ট বিষয়েই, মমতা সরকার বিব্রত অবস্থায় পড়ে এমন কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা-মন্তব্য-সুপারিশ করা নেই। সারবস্তুতে এ এক সরকার-ভজা খসড়া রিপোর্ট মাত্র। রিপোর্ট যেমন সুপারিশ করেছে, তৃণমূল ও কংগ্রেসের জোট সরকারকে বামফ্রন্ট জমানায় তৈরী ২০০৩ সালের 'সেজ' আইন বাতিল করতে ঘোষণা করতে হতে পারে। কিন্তু কোন উদ্যোক্তা রপ্তানী বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুবিধা পেতে 'সেজ' বানানোটা কাজে দিতে পারে বলে যদি দাবি জানায়, তাহলে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে বিশেষজ্ঞ কমিটি দিয়ে। আর বিশেষজ্ঞ কমিটি যদি সম্মতি দেয় তবে ঐ উদ্যোক্তাকে 'সেজ' বানানোর সরকারি অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। বা! চমৎকার! বেশ 'যদি'-'কিন্তু' সহযোগে শর্তসাপেক্ষে 'সেজ' আইন বাতিল ও রূপায়ণের এক জগাখিচুড়ি সুপারিশ রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বড় শয়তানীটা হল, 'সুকৌশলে' সেই বামফ্রন্ট জমানার মতই এক্ষেত্রে কৃষকের অধিকারকে বিবেচনার মধ্যে স্থানই দেওয়া হচ্ছে না। রপ্তানী বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশেষ সুযোগ নিতে 'সেজ'-এর ওকালতি করাটা তো চেনা বাহানা! 'সেজ' ধারণা-পলিসি-প্রকল্প, সবটাই তো সবচেয়ে নৃশংস মুনাফামুখী ও উৎপাদিকা শক্তিগুলোকে দমনমুখী ব্যাপার। আর, 'সেজ' আইন প্রত্যাহার করেও 'সেজ' বানানোর 'ব্যতিক্রম' অনুমোদন দেওয়া মানে তো অঘোষিতভাবেই 'সেজ' বানানোর ছাড়পত্র দেওয়া। তাই নয় কি? ব্যানার্জী-বোস কমিটি যদিও মনে করে, নির্ধারিত বর্তমান উর্ধবসীমার আওতাতেই এখনও বহু জমি খাস করা ও সরকারের হাতে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু উর্ধবসীমা আরও কমানোর কোন মত কমিটির নেই। কারণ তাহলে নাকি কৃষি অর্থনীতির ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে! এভাবে প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ ধনিক ও স্বচ্ছল শ্রেণীর বিশেষত পুঁজিবাদী কুলাকশ্রেণীর অর্থনীতিকে যাতে গরিব কৃষক শ্রেণীর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হতে হয় তারই সওয়াল করা হয়েছে। এই কমিটির মতে, এরাজ্যে অনুপস্থিত জমিদারিতে এখনই হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সেটা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকতেই পারে। কমিটির মতে, বর্গাচাষিদের জমির মালিকানা দেওয়ার দাবিটি নৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ন্যায়সঙ্গত হলেও উত্তেজনা এড়ানোর জন্য এই পলিসি থেকে এখন বিরত থাকা উচিত। এসব বামফ্রন্ট জমানার কুযুক্তির কম অনুকরণ! সুপারিশ করা হয়েছে, কৃষকদেরকে 'জমি কিনে ভূমিদান প্রকল্প', 'ব্যাঙ্ক ঋণের সহায়তায় জমি কেনার প্রকল্প'কে উৎসাহদানের পলিসিকে। এভাবে মমতা সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিগত সরকারেরই কতকগুলো ছকবাঁধা নিয়ন্ত্রিত এবং গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্ক তৈরীর সমন্বয় প্যাকেজ

মগরাহাটে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির জঙ্গী বিক্ষোভ প্রদর্শন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তিতে অবস্থিত মগরাহাট ১ নং ব্লকে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির ডায়মণ্ডহারবার-উস্তি ব্লক কমিটির নেতৃত্বে এক

সংগ্রামী মানুষের সামনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন দিলীপ পাল। তিনি স্মারকলিপি পাঠ করে শোনান। তারপর দিলীপ পালের নেতৃত্বে জগদীশ মণ্ডল, তুলসী

... বর্গা রেকর্ডের ভয়ে জমির মালিক জমি ফেলে রাখেন, কিন্তু অন্য কাউকে চাষ করতে দিতে চান না। এই ধরনের পতিত জমিকে জমির মালিকানা ও স্বত্ব অবিকৃত রেখে চাষ করতে ইচ্ছুক এমন চাষিদের দিয়ে শর্তসাপেক্ষে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি চাষ করানো ...। মালিককে উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ দেওয়া যেতে পারে'। (পৃঃ ১৭)।

মোটামুটি এগুলোই ছিল তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহারে 'কৃষি ও জমি' প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান প্রতিশ্রুতি। যেগুলো সরকার ক্ষমতায় আসার পর সর্বাগ্রাধিকার হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত। সেই অর্থে বিচার করা দরকার তৃণমূল জোট সরকার ঠিক কোন্ প্রবণতা দেখাচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মমতা সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই মে মাসের শেষাশেষি একটা 'জমি ব্যবহার কমিটি' গঠন করে, সেই কমিটি গঠন হওয়ার এক পক্ষকালের মধ্যেই 'পশ্চিমবঙ্গের জমি ব্যবহার নীতি' সংক্রান্ত খসড়া রিপোর্ট তৈরী করে রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরে জমাও দিয়ে দিয়েছে। এই কমিটি দুই সদস্যের। ডি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমেন্দ্র চন্দ্র বোসকে নিয়ে। প্রথমজন দেবব্রতবাবু, রাজ্যের একজন বহু পরিচিত প্রাক্তন আমলা। বামফ্রন্ট জমানার মধ্যভাগে সরকার নিযুক্ত 'মুখার্জী-ব্যানার্জী কমিটি'তে তিনি দু-জনের একজন ছিলেন। অপারেশন বর্গার মতন আধা ভূমিসংস্কারের কার্যক্রম নিয়ে বামফ্রন্ট এবং সি পি এম প্রয়োজনবাদের খাস স্বার্থেই কিভাবে প্রথমে জিগির তোলে, তারপরে মাঝপথে অঘোষিতভাবে পরিত্যক্ত করে দেয়, তার বিরুদ্ধে ঐ কমিটি তোপ দেগেছিল। স্বভাবতই বামফ্রন্ট সরকার মুখার্জী-ব্যানার্জী কমিটির সুপারিশ মানতে অস্বীকার করেছিল। তার অন্যতম সদস্য দেবব্রতবাবু পরবর্তীতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্ব থেকে তৃণমূলের উত্থানের সাথেই নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। তাই পরিবর্তিত সরকারের উপরোক্ত 'জমি ব্যবহার কমিটি'তে তিনি স্থান পেয়েছেন প্রধান ভূমিকায়। ঐ কমিটির যিনি অপর সদস্য, তিনি পেশাগতভাবে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী, তবে জমি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তিতে অবস্থিত মগরাহাট ১ নং ব্লকে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির ডায়মণ্ডহারবার-উস্তি ব্লক কমিটির নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর সোমবার চৌষার মোড় থেকে শুরু হয় প্ল্যাকার্ড ও লালঝাণ্ডায় সুসজ্জিত মিছিল। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির জেলা সম্পাদক দিলীপ পাল, জেলা সদস্য জগদীশ মণ্ডল, দীনবন্ধু মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক জয়দেব নস্কর ও পার্টির জেলা সম্পাদক কিশোর সরকার। এই মিছিলে প্রায় ৬০ শতাংশ মহিলা অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিল যত এগিয়েছে ততই তার পরিধি বেড়েছে। শেষে ১৫০ জন মানুষ সামিল হন। সাধারণ মানুষের জীবন্ত দাবিগুলো প্রতিফলিত হওয়ায় তা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আদায় করে।

বিডিও দপ্তরের সামনে সমাবেশিত হয়ে পুলিশের উপস্থিতিকে তোয়াক্কা না করেই শ্লোগানের মেজাজ আরও চড়তে থাকে। উপস্থিত সংগ্রামী মানুষের সামনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন দিলীপ পাল। তিনি স্মারকলিপি পাঠ করে শোনান। তারপর দিলীপ পালের নেতৃত্বে জগদীশ মণ্ডল, তুলসী নস্কর, দীনবন্ধু মণ্ডল প্রমুখ প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি পেশ করতে যান। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা পার্টি সম্পাদক কিশোর সরকার।

দাবিসনদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কিছু কিছু বিষয় যাতে প্রত্যেক এলাকায় কার্যকরী হয় তা দেখার প্রতিশ্রুতি দেন বিডিও, জয়েন্ট বিডিও ও কৃষি আধিকারিক। নিম্নলিখিত দাবিগুলো পেশ করা হয়—

(১) সমস্ত বুথে এন আর ই জি এ প্রকল্প চালু করতে হবে। (২) সমস্ত গরিব মানুষকে বি পি এল কার্ড প্রদান করতে হবে। (৩) অতি বর্ষণে ফসলের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (৪) ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। (৫) অবিলম্বে হিমঘর তৈরী করতে হবে, সহায়ক মূল্যে ধান কিনতে হবে (১৫০০ টাকা কুইন্টাল)। (৬) গরিব-নিম্ন-মাঝারি চাষিদের সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয়ের জন্য বিনা সুদে ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে হবে।

বাটায় ... মিছিল

দুয়ের পাতার পর

দেখানো হয়। আর সরকারি কল্যাণ পর্ষদের সুযোগ-সুবিধার বিষয় লেবারদের কিছুই জানানো হয়নি।

এই মধ্যযুগীয় জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো হয়। যেমন মিছিল, পথসভা, পোস্টারিং, শ্রমিকদের মধ্যে ঘরে ঘরে প্রচার করা হয়।

শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে স্থানীয় নির্মাণ শ্রমিকরা সি আর এস প্রজেক্ট লোকাল ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন নামে একটি সংগঠন বানিয়ে অবস্থান কর্মসূচী নেয়। কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিসনদ পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ অনমনীয় মনোভাব দেখানোয় প্রজেক্টের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকরা ধর্মঘটের পথে এগিয়ে যান।

পশ্চিমবঙ্গ গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কিশোর সরকারের উদ্যোগে আর বাটা শ্রমিকদের একটি অংশের সহযোগিতায় দ্রুতই সংগ্রামরত শ্রমিকদের আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে সবরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন। বাটা নির্মাণ শ্রমিকদের সংহতিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর এক মিছিল সংগঠিত করা হয়। উক্তদিনে কর্তৃপক্ষের স্থানীয় দপ্তরের সামনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কিশোর সরকার। কেন্দ্রীয় আইনকে লঙ্ঘন করে কিভাবে শ্রমিকদের মজুরি চুরি হচ্ছে, নিরাপত্তাজনিত আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন।

জমি কেনার প্রকল্প'কে উৎসাহদানের পালাসকে। এভাবে মমতা সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিগত সরকারেরই কতকগুলো ছকবাঁধা নিয়ন্ত্রিত এবং গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্ক তৈরীর সমন্বয় প্যাকেজ অনুসরণের জন্য।

তৃণমূল অবশই বিশেষ করে কৃষকদের বামফ্রন্ট বিরোধী অসন্তোষের স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারে ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু এখনও তার গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্ক বলতে যা বোঝায় সেই মজবুত গরিব সামজিক ভিত্তি তার হয়নি। চাপ রয়েছে, চাপ থাকবে দুদিক থেকেই। একদিকে জমির কর্পোরেটকরণের চাপ, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ভূমিসংস্কারের দাবি। এই দুইয়ের মধ্যে মমতা সরকার কোন্ দিকে থাকে সেটা সময় বেড়ে চলার সাথে সাথে আরও পরিষ্কার হবে। চুক্তি চাষের প্রশ্নে সরকার নিযুক্ত কমিটির সুপারিশ হল, ঢালাও উৎসাহদান ঠিক হবে না, অন্তত কিছু সুরক্ষা আইন থাকতে হবে। তার মানেই, ঘুরিয়ে চুক্তি চাষে ইন্ধনের সুপারিশ। একটু আধটু সুরক্ষার আইনের আবহাওয়াও থাকুক, আবার চুক্তি চাষও চালাতে দেওয়া যেতে পারে। এত দ্রুত কি 'পরিবর্তন' নিয়ে আসার 'মা-মাটি-মানুষের' ছদ্মবেশ ছিন্ন হতে দেওয়া যায়! তাহলে ক্ষমতায় দীর্ঘস্থায়ী হতে চাওয়ার সাধ মিটবে কি করে!

আলোচনা শুরু হয়েছিল তৃণমূলের 'কৃষি ও জমি' সংক্রান্ত নির্বাচনী কথা ও তাদের জোট সরকারের কাজের যাচাই শুরু করা দিয়ে। তাদের তৈরী একটা কমিটির রিপোর্টের মধ্যে খতিয়ে দেখার একটা সুযোগ মিলল। তার বাইরে সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাদের সরকার এখনও পর্যন্ত একটিও কোন নির্দিষ্ট অবস্থানগত ঘোষণা, পদক্ষেপ নেয়নি, একটিও কোন কাজের কাজ করে দেখানো দূরের ব্যাপার, একটিও গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু ভেঙ্গে দেখাতে পারেনি। উল্টে বর্গাদার-পাট্টাদারদের ওপর হামলার, পঞ্চায়েতী দুর্নীতির, জমির দালালীর দাপট দেখানো শুরু করেছে তৃণমূল। ড্রামাবাজী চলছে যত বিনিয়োগপতিদের জন্য ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক কিংবা কলকাতাকে 'লণ্ডন' বানানো নিয়ে।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

এ আই সি সি টি ইউ-র আসন্ন ৮ম সর্বভারতীয় সম্মেলনের আহ্বান

শ্রমিকশ্রেণীর চলমান আন্দোলনের নতুন গতিশীলতাকে আয়ত্ত করুন!

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তির পরিকল্পিত বিস্তারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন!

ছত্তিশগড়ের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলের অন্যতম ভিলাই ইস্পাত নগরীতে নভেম্বর ২০১১-এর ২য় সপ্তাহে হতে চলেছে ৮ম সর্বভারতীয় সম্মেলন। সুষ্ঠুভাবে সম্মেলনকে সম্পন্ন করার থেকেও বড় কথা হল, এই সম্মেলন কিভাবে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৃহত্তর সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে, ফুটিয়ে তুলবে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের বিপ্লবী চরিত্রকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আসুন ৮ম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টের মূলনীতির দিকে চোখ রাখি ঃ

"সর্বশেষ সদস্য গণনার ভিত্তিতে সরকারিভাবে এ আই সি সি টি ইউ-কে একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রটিকে যেমন তার সদস্য সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে তেমনি আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাকে কাজের বিস্তার ঘটিয়ে উদ্যোগী হতে হবে এবং সাংগঠনিক কার্যকলাপে ... তাকে প্রথম বিপ্লবী বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র হিসাবে আদায় করতে হবে কেন্দ্রীয়স্তরে স্বীকৃতি। আমাদের স্বাধীন উদ্যোগের দ্বার খুলে দেওয়ায় মনোযোগী হতে হবে এবং নিজেদের গড়ে তোলা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের নিজস্ব সংগ্রামী পরিচিতি বাড়ানোর পাশাপাশি সময়োচিত সংহতিমূলক কার্যকলাপ বাড়িয়ে তুলতে হবে।"

বিগত তিন বছরে উপরোক্ত পথনির্দেশ অনুযায়ী আমাদের কার্যকলাপের অভিজ্ঞতায় এ আই সি সি টি ইউ-র সর্বভারতীয় সম্মেলনের জন্য আমাদের কর্তব্য ও লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

এক নজরে বর্তমান পরিস্থিতি

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও এখন পুনর্গঠিত হচ্ছে। অতীতে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যেমন অতি সীমাবদ্ধ বা আইনি অধিকারের দাবিতে সংগ্রাম করত এখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও প্রায় একই অবস্থায় তাদের শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বাধ্য হচ্ছে।

(ঙ) ভারতীয় শাসক শ্রেণীর নানা রংবেরঙের সরকার যে পলিসি নিয়ে চলছে, তাকে কেন্দ্র করেই শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান আন্দোলনের ইস্যুগুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং এই ইস্যুগুলো নিয়ে যে শ্রমিক আন্দোলন চলছে সেগুলো বস্তুগতভাবে রাজনৈতিক চরিত্রের এবং সরকারের পলিসিগুলো বাতিল করার দাবি ও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে সংগঠিত ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অর্থনীতিবাদি ও অরাজনৈতিকীকরণের ঝোঁকের প্রাধান্য রয়েছে। এই স্ববিরোধী অবস্থাকে প্রতিহত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার পুনরুজ্জীবনের দাবি সময়োচিত।

বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনের নতুন প্রবণতা

অর্থনীতিবাদী এবং আইনবাদী খোলসের থেকে মূলস্রোতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামকে বার করে আনার জন্য বস্তুগত অবস্থার বিকাশই বাধ্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো বারে বারে উদারিকরণের পলিসি ও তার অভিঘাতের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছে যৌথ রাজনৈতিক প্রচারাভিযান। এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ শক্তির চমকপ্রদ প্রতিবাদী জমায়েত করা হয়েছে দেশের রাজধানীতে। কিন্তু

সংগঠিত শিল্পে আমাদের কাজের নব-উদ্দীপনার লক্ষ্যে

এ আই সি সি টি ইউ-র জন্মলগ্ন থেকে সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের উপস্থিতি ছিল কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ও রুগ্ন শিল্পের অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে। আমরা শুরু থেকে সংগঠিত শিল্পের মধ্যে ইস্পাত ও কয়লা শিল্পে এবং দিল্লীর ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে আমাদের ইউনিয়ন তৈরী করতে পেরেছি। পরিষেবা সেক্টরে, যেমন সেন্ট্রাল হেল্‌থ অথবা ঐক্যবদ্ধ বিহারের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ফেডারেশন এ আই সি সি টি ইউ-র গড়ে ওঠার সময় থেকেই গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। পরে সংগঠিত শিল্পে এ আই সি সি টি ইউ তার প্রভাব বৃদ্ধি র লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বর্তমানে সংগঠিত শিল্পে আমাদের কাজের খতিয়ান নিম্নরূপ—

(ক) ইস্পাত ও কয়লা শিল্পে আমাদের পুরোনো কাজের জায়গায় নতুনভাবে বিস্তার ঘটাতে বা নেতৃত্বের জড়তা ভাঙতে না পারার জন্য একরকম স্থিতাবস্থা চলছে। (খ) তামিলনাড়ুতে বড় কর্পোরেট সেক্টরে এবং কলকাতা ও দিল্লীর ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে আমাদের ভাল অনুশীলন চলছে। (গ) ভারতীয় রেলের চারটি জোনে এবং পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ সেক্টরে এ আই সি সি টি ইউ-অন্তর্ভুক্ত একটি ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ আই সি সি টি ইউ-র মূলস্রোতের কার্যকলাপে এই অনুশীলন এখনও আত্মস্থ হয়ে ওঠেনি। (ঘ) সংগঠিত সেক্টর যেমন তেল, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক ও বড় কর্পোরেট সেক্টরের বিভিন্ন ইউনিয়ন ও

দ্বিগুণ করতে হবে। রেলে এ আই সি সি টি ইউ এবং আমাদের গ্রুপগুলোর একটি কার্যকরী যৌথ উদ্যোগ চালানো খুবই প্রয়োজনীয়। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়েই আমাদের পার্টির প্রভাব ও জনপ্রিয় নেতৃত্বের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। আমরা লক্ষ্য করেছি রেল সেক্টরে কয়েকটি রাজ্যে এবং রেলওয়ে জোনে সোশ্যালিস্ট এবং এইচ এম এস-এর আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও বিজেপি এবং বি এম এস, সি পি এম এবং সি আই টি ইউ তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। একইভাবে, আমরাও বিহার, ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এবং ইউ পি-র কিছু কিছু অংশে এবং রেলের কিছু কিছু জোনে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হব।

অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করা প্রসঙ্গে

ট্রেড ইউনিয়নের আঙ্গিনায় এ আই সি সি টি ইউ-র প্রবেশ দেরীতে হওয়ায় শুরুতে একরকম বাধ্য হয়েই তাকে ক্ষুদ্র/রুগ্ন শিল্পে ও অসংগঠিত শিল্পে জায়গা করে নিতে হয়েছে। কিন্তু পরে, উদারীকরণের যুগে অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকরাই রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শ্রমিক আন্দোলনের পুনর্বিন্যাস ও ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রে। সুতরাং বাস্তবেই অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকরা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এক শক্তি হিসাবে সামনে আসছে।

অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজের কিছু বিবরণ

(ক) পুরোনো বৃহৎ পরিষেবা ও শিল্পক্ষেত্র যেমন, ইস্পাত, কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ, রেলওয়ে, টেলিকম ইত্যাদি শিল্পে ঠিকা শ্রমিক প্রথার প্রচলন বেড়েছে। এখানে আমাদের সামনে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ

অনুযায়ী আমাদের কার্যকলাপের অভিজ্ঞতার এ আই সি সি টি ইউ-র সর্বভারতীয় সম্মেলনের জন্য আমাদের কর্তব্য ও লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

এক নজরে বর্তমান পরিস্থিতি

বিগত দুই দশকের অর্থনৈতিক উদারিকরণের অভিঘাতে শিল্পীয় ও পরিষেবা সেক্টরের চালচিত্র অনেক বদলে গিয়েছে। পরিবর্তনের প্রধান যে ধারাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হল ঃ

(ক) ক্রমবর্ধমান ঠিকাদারী প্রথা এবং অস্থায়ীকরণের ফলে শ্রমিক আন্দোলনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে শিল্পীয় ও পরিষেবা সেক্টরে সংগঠিত ও অসংগঠিত উপাদান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর বিশাল বাহিনীর উত্থান শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত এবং উন্নত সংগ্রামী শক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

(খ) ঠিকা ও ক্যাজুয়াল শ্রমিক প্রথা এখন প্রাধান্যকারী ধারা ও সস্তা শ্রমের শোষণকারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং এটা এখন শুধুমাত্র মজুরির বৈষম্য হিসাবে দেখলে চলবে না। বরং পুঁজি তার পথ পরিষ্কার করতে জবরদস্তি লাগু করছে নির্মম কাজের পরিবেশ। আর বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিল্পাঞ্চলে যেমন এস ই জেড, ই পি জেড, এফ টি জেড বা সর্বশেষ প্রস্তাবিত এন এম আই জেড ইত্যাদি মারফৎ বর্তমান শ্রম কানুনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো হচ্ছে বা তা কার্যকরি করা হচ্ছে না।

(গ) ঠিকাদার/মাফিয়া-রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র/কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট-প্রশাসক/পুলিশ-এর একধরনের অশুভ চক্র গড়ে উঠেছে, যারা সমসাময়িক শিল্পক্ষেত্রে ও পরিষেবা ক্ষেত্রে "অর্থনীতি বহির্ভূত" জুলুমবাজী চালাচ্ছে যখন শ্রমিকরা তাদের অধিকার ও নিরাপত্তার জন্য সংগঠিত হওয়ার সাহস দেখাচ্ছেন।

(ঘ) বিশাল অসংগঠিত বাহিনী তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আর এদের সংগঠিত করাটাই আজ ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। নতুন বাস্তবতার এই চ্যালেঞ্জের সামনে পুলিস ও তার অভিঘাতের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছে যৌথ রাজনৈতিক প্রচারাভিযান। এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ শক্তির চমকপ্রদ প্রতিবাদী জমায়েত করা হয়েছে দেশের রাজধানীতে। কিন্তু এই নতুন পদক্ষেপ সত্ত্বেও, তারা তাদের পুরানো ধারাগুলো ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। নেতৃত্ব চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে কারখানা এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের তৃণমূলস্তরে এই দৃঢ় শ্রমিক ঐক্যর অঙ্কুরকে পল্লবিত করতে অথবা সর্বস্তরের শ্রমিকদের মধ্যে সংহতিমূলক কাজের মাধ্যমে তাকে একটা অর্থপূর্ণ শ্রেণী ঐক্যের রূপ দিতে।

অপরপক্ষে, নতুন ধারার শ্রমিক আন্দোলনগুলো নতুন নতুন রূপ, নেতৃত্ব এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠছে। আমাদের কখনই নতুন ধারার আন্দোলনগুলোকে কেবলমাত্র শ্রমিকদের বিদ্রোহ ঘোষণা বা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ হিসাবে ভাবলে চলবে না। বরং বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় দীর্ঘস্থায়ী কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে তারা তাদের দাবি আদায় করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক, প্রিকল শ্রমিকদের লড়াই, গুরগাঁওয়ে হণ্ডা শ্রমিকদের সংগ্রাম, এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমান চালকদের ধর্মঘট, মারুতি শ্রমিকদের বর্তমান সংগ্রাম, আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-মিড-ডে মিল কর্মীদের সংগ্রাম এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্যাজুয়াল/ঠিকা শ্রমিক যারা সরকার/ম্যানেজমেন্ট/প্রশাসকদের সঙ্গে সংঘাতে যেতে কখনই দ্বিধাগ্রস্ত হয় না।

নতুন ধারার সংগ্রামগুলোর কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়ে লড়াইকে সঠিক পথে চালিত করেছি, যেমন প্রিকলের লড়াই, কলকাতার ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক সংগ্রাম বা বিহার, আসাম, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ডের "আশা"কর্মী এবং পার্শ্ব-শিক্ষকদের লড়াই ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

আমাদের বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ধারাগুলোকে আয়ত্ত করতে হবে এবং আমাদের বহুমুখী ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতা অর্জন করতে হবে ও স্বাধীন উদ্যোগ বাড়িয়ে তোলার দ্বার খুলে দিয়ে আমাদের নিজেদের সংগ্রামী এলাকার বিস্তার ঘটাতে হবে।

সি সি টি ইউ-র মূলস্রোতের কার্যকলাপে এই অনুশীলন এখনও আত্মস্থ হয়ে ওঠেনি।

(ঘ) সংগঠিত সেক্টর যেমন তেল, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক ও বড় কর্পোরেট সেক্টরের বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের এবং কেন্দ্রীয়-রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন অংশে আমাদের এ আই সি সি টি ইউ গ্রুপ রয়েছে। কিন্তু এখানেও আমরা লাগাতার স্বাধীন উদ্যোগের ক্ষেত্রে এবং এ আই সি সি টি ইউ-র সাথে আরও উন্নত ও জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থায় পড়েছি।

সংগঠিত সেক্টরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং অংশ হল ঠিকা ও অস্থায়ী শ্রমিক, যারা তাদের নিজস্ব সেক্টরগুলোর মধ্যে ভবিষ্যতের শ্রম আন্দোলনের গতিময়তার ধারক বাহক হয়ে উঠবে, তাদের মধ্যে আমাদের প্রাণবন্তভাবে সংগঠনের কাজে মন দিতে হবে। আমাদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে কোন সংগঠিত ক্ষেত্রের অগ্রণী শ্রমিকরা যদি সেই সেক্টরের অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে তবে তা নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যেটা সংগঠিত শিল্পের ব্যাপক শ্রমিকদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে।

দ্বিতীয়ত এমন একটি সংগঠিত শিল্পের কথা ধরুন যেখানে এ আই সি সি টি ইউ গ্রুপ রয়েছে কিন্তু আমাদের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন নেই। এখানে আমাদের চ্যালেঞ্জ হল ঐ ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত একঘেয়ে কার্যকলাপের ঘেরাটোপ ভেঙ্গে ফেলা। আমাদের মনোযোগ দিতে হবে সেক্টরের অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে, সঠিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের দীর্ঘস্থায়ী অভাবকে পূরণ করা, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে জোরের সাথে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে। এর সাথে যুক্ত করতে হবে শ্রমিকদের মধ্যে প্রাণবন্ত এক গণরাজনৈতিক প্রচারক হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলা।

তৃতীয়ত, মূল সংগঠিত শিল্পগুলোর মধ্যে যেমন রেল শিল্পে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের সম্ভাবনাগুলোকে খুঁজে দেখতে আমাদের প্রচেষ্টাকে

(ক) পুরোনো বৃহৎ পরিষেবা ও শিল্পক্ষেত্র যেমন, ইস্পাত, কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ, রেলওয়ে, টেলিকম ইত্যাদি শিল্পে ঠিকা শ্রমিক প্রথার প্রচলন বেড়েছে। এখানে আমাদের সামনে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হল, ঠিকা শ্রমিকদের তাদের নিজ নিজ শিল্পের শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা, প্রধান নিয়োগকর্তা হিসাবে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লক্ষ্যবস্তু ঠিক রাখা এবং সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে প্রাণবন্ত ঐক্য গড়ে তোলা।

(খ) সরকারি বিশেষত রাজ্য সরকারি পরিষেবা সেক্টরে ঠিকা প্রথাই এখন প্রধান প্রবণতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-মিড-ডে মিল কর্মী-পার্শ্ব শিক্ষক-পি ডব্লিউ ডি, জলসেচন, জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সম্পর্কিত ঠিকা শ্রমিকদের বিশাল বাহিনীর কথা। আমাদের সামনে এখন প্রধান কাজ হচ্ছে, ঠিকা শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গী এবং মুখোমুখি সংঘর্ষের মনোভাবকে এক কার্যকরী সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে চালানো এবং একে মূলস্রোতের ফেডারেশনগুলোর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত করা।

(গ) কর্পোরেটমুখী উদারিকরণের যুগে গড়ে ওঠা বড় ও মাঝারি কর্পোরেট শিল্প ও কারখানাগুলোতে নানা ছুতো-নাতায় শ্রম আইনকে কার্যত পরিত্যাগ ও পরিত্যক্ত করা হয়।

এই কারখানাগুলোতে অস্থায়ী শ্রমিকরা বিভিন্ন রূপে শুরু থেকে সংখ্যায় বেশী। সুতরাং এখানে অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা অথবা ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম গড়ে তোলা সমার্থক।

(ঘ) অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন অংশটি হল নির্মাণ (যার মধ্যে ইঁটভাটা, পাথর খাদান, কাঠমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি, পরিকাঠামো তৈরীর মিস্ত্রি, বালি তোলা শ্রমিক ইত্যাদি), বিড়ি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, হোটেল ইত্যাদি ও বনদপ্তরের শ্রমিক বা বিভিন্ন কৃষিনির্ভর শিল্পের শ্রমিকরা। এখানে বড় চ্যালেঞ্জ

পাঁচের পাতায় দেখুন

... ৮ম সর্বভারতীয় সম্মেলনের আহ্বান

চারের পাতার পর

হল একটি কার্যকরী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলে তাকে সেক্টরভিত্তিক সর্বভারতীয় ফেডারেশন (যেমন নির্মাণ শিল্পে আমরা গড়ে তুলেছি) পরিণত করা।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে আমাদের সামগ্রিক কাজের ফলাফলে যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে বলা যায় আগামীদিনে আমাদের সংগঠিত প্রচেষ্টাকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে আমাদের পরিচিতির বিস্তার ঘটবে।

এরজন্য পরিস্থিতি দাবি করছে, প্রথমত, অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তার জন্য তাদের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে সরকারি পলিসিগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানানো।

দ্বিতীয়ত, অসংগঠিত শ্রমিকদের এই বিশাল অংশের কর্মক্ষেত্রে অস্থায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে প্রাণবন্ত যোগাযোগ রাখায় যেমন মনোযোগ দিতে হবে তেমনি আমাদের নজরকাড়া কর্মপদ্ধতি এবং ধারা আয়ত্ব করতে হবে। শ্রমিক মহল্লাগুলোতে আমাদের কাজের প্রসার ঘটানো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

তৃতীয়ত, অসংগঠিত শ্রমিকদের ভেতর থেকে ক্যাডার এবং কর্মীদের গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের স্বাধীন উদ্যোগ ও সক্রিয়তার স্ফূরণ ঘটাতে হবে।

আমাদের দেশে বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনে নতুন বিপ্লবী ও আমূল পরিবর্তনের জোয়ার আনার ভিত্তি হচ্ছে এই কাজগুলোর সাফল্য।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী 'এলাকা' গড়ে তোলা প্রসঙ্গে

অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের এলাকা গড়ে তোলা হবে এবং এর জন্য ৫০টি জেলাকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ও ২০টি জেলাকে জরুরী ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আমাদের সিদ্ধান্তকে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন প্রয়াস আদৌ পর্যাপ্ত ছিল না।

(ক) নেতৃত্বকারী কেন্দ্র হিসাবে পার্টি এরিয়া কমিটি গঠন। (খ) ৩০০০ ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য সংগ্রহ করা (সংগঠিত এবং অসংগঠিত শ্রমিক)। (গ) সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে ইউনিয়ন গড়ে তোলা (অন্তত ১টি করে প্রতি ক্ষেত্রে) এবং কমপক্ষে ১০০ শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং ২০ জন নেতৃত্বকারী ক্যাডার তৈরী করা। (ঘ) পরিকল্পিতভাবে এবং দফায় দফায় ৩০,০০০ শ্রমিকের কাছে গণরাজনৈতিক প্রচারকে নিয়ে যাওয়া। (ঙ) শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের প্রভাব অনুযায়ী অন্যান্য গণসংগঠন যেমন এ আই এস এ, আর ওয়াই এ এবং এ আই পি ডব্লিউ এ-কে গড়ে তোলা।

লক্ষ্যমাত্রাকে মান ধরে আমরা আমাদের কাজের ফল অনুযায়ী বিচার করতে পারি।

ট্রেড ইউনিয়নের গণতান্ত্রিকীকরণ এবং শ্রমিকদের রাজনীতিকরণ

একটি বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র হিসাবে এ আই সি সি টি ইউ-র মূল দিশার সাথে এই প্রশ্নটি সম্পর্কযুক্ত। ট্রেড ইউনিয়ন কাজের প্রাথমিক পর্ব থেকেই আমরা চেষ্টা করেছি ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত করতে যা শ্রমিকদের সক্রিয়তা ও উদ্যোগের মধ্যে নিহিত থাকবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে তাদের নজরদারি এবং যৌথ কার্যক্রম। এখানে আমরা মডেল ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে অন্যান্য সংস্কারবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কার্যক্রমের সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা টেনেছি।

কিন্তু, কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া বাস্তবে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। বাস্তব সত্য হল, নতুন গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়নগুলো পুরাতন ট্রেড ইউনিয়নগুলোর থেকে বেশি প্রাণবন্ত। এখানে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রভাবিত ক্ষেত্রের বা সদস্য সংখ্যার শ্রমিকদের মধ্যে কমবেশি আবদ্ধ হয়ে আছি। জড়তা ভেঙ্গে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর বিস্তৃত অংশের মধ্যে এখনও পৌঁছাতে পারিনি।

দ্বিতীয়ত, ট্রেড ইউনিয়নগুলো সহ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমাদের যে অনুশীলন চলছে, সেক্ষেত্রে রাজনীতি নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে অভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থা এখনও আমরা তৈরী করতে পারিনি। বরং রাজনীতি দেওয়ার কাজটি এখনও বহিরাগত পদ্ধতিতে আটকে রয়েছে কয়েকটি সমাবেশ বা বিশেষ কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানানোর মধ্যে।

তৃতীয়ত, পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন বহির্ভূত শ্রমিক ফোরাম-এর যৌথ প্রচেষ্টায় গণরাজনৈতিক প্রচারের নিয়মিত কোন ব্যবস্থাপনা আমরা এখনও গড়ে তুলতে পারিনি।

চতুর্থত, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের কোন এলাকা গড়ে তুলতে পারলে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নে বাধা অতিক্রম করার আশা করতে পারি।

উপসংহার

এ আই সি সি টি ইউ আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সদস্য দ্বিগুণ করা হবে শিল্প ও পরিষেবা সেক্টরে এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হবে রাজ্য ও সেক্টর অনুযায়ী। কিন্তু সম্মেলনের চাপে শুধু সদস্য সংখ্যা বাড়ানোটা আমাদের লক্ষ্য হতে পারে না। বরং সদস্য সংখ্যার বিস্তারের মধ্য দিয়ে আমরা কিছু কিছু গুণগত ফলাফল পেতে চাইছি, বিশেষত আমাদের পুরোনো সমস্যাগুলোকে কাটানোর লক্ষ্যে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি ঝাড়খণ্ডে আমরা কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে কোন নতুন গতি না এনে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারি, তাহলে এটা কোন প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসাবে গণ্য করা হবে না। পশ্চিমবঙ্গেও বামফ্রন্টের পতনের পর সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টাটি যদি সিটুর ভাঙ্গনের সাথে যুক্ত করা না যায় তাহলে আমাদের এই অনুশীলন বঞ্চিত হবে বস্তুগত গতিময়তা থেকে নতুন নতুন শক্তিকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে। আসামেও যদি আমরা নতুন নতুন সেক্টরে অগ্রগতির মধ্য দিয়ে সদস্য চা বাগানের শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে পুনর্গঠিত এবং সক্রিয় করে তুলতে পারি। অনুরূপে উড়িষ্যাতেও আমাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যম অর্থবহ হবে যদি খনি সেক্টরে আমরা অল্পমাত্রায় হলেও কাজ শুরু করতে পারি।

শ্রমিকশ্রেণীর জ্বলন্ত ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে এক প্রাণবন্ত মতাদর্শগত প্রচার আন্দোলন আমাদের সংগঠিত করে তুলতে হবে বাছাই করা শিল্পাঞ্চলগুলোতে, যা কিনা সদস্য অভিযানে একটি সহায়ক পরিমণ্ডল তৈরী করবে।

আমাদের এখন টি ইউ সদস্য সংখ্যার সমানুপাতে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী গঠনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে (প্রতি ১০০০ ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য পিছু ১ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং ১০ জন ট্রেড ইউনিয়ন সক্রিয় কর্মী গঠনের ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা আমরা স্থির করতে পারি)।

সংগঠিত সেক্টরে, ইস্পাত ও কয়লা শিল্পে যেমন আমরা শ্রমিক আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চাইছি তেমনই রেলওয়েতেও আরও শক্ত ভিত গড়ে তোলায় মনোযোগ দিতে পারি এবং এর সাথে রেলওয়ে ঠিকা শ্রমিকদেরও সংগঠিত করতে পারি। অসংগঠিত সেক্টরে, নির্মাণ শ্রমিকদের ফেডারেশন আমাদের কার্যকরীভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং এটা করতে হবে ছোট ছোট এলাকার মধ্যে বা শ্রমিক কল্যাণ স্কীমে আটকে না থেকে একদল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং নেতা গঠনের মাধ্যমে। আমাদের কাজের কিছু রদবদল করতে হবে এবং এটা সম্ভব হবে ইঁটভাটা, পাথর খাদান, কাঠের মিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, লোহার ফ্যাব্রিকেশনের মিস্ত্রি, বালি তোলা শ্রমিকদের থেকে কর্মী ও নেতাদের সংযুক্ত করে।

এ আই সি সি টি ইউ-র জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে যে প্রচার পর্ব চলছে তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকটি এলাকা গড়ে তোলার শর্ত আমরা পরিপক্ক করে তুলতে পারব।

ভবিষ্যতের এই দিশায় আমরা সংগঠিতভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে একটি বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন

ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আমাদের সিদ্ধান্তকে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন প্রয়াস আদৌ পর্যাপ্ত ছিল না।

এই কাজে যদি সত্যিই আমাদের অগ্রগতি ঘটাতে হয় তাহলে এটা খুবই জরুরী যে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজ সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ সুস্পষ্ট ধারণা আয়ত্ব করা এবং এটা করতে হবে সামগ্রিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীর সম্পূর্ণ কাজকে শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের কাজে গণ্ডীবদ্ধ করে ফেলার আধিবিদ্যক ধারণাগুলোকে ক্রমাগত দ্বান্দ্বিকভাবে নাকচ করার মাধ্যমে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পার্টি গঠন এবং গণরাজনৈতিক প্রচারের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমেই ট্রেড ইউনিয়নের কাজের সামগ্রিকতা। স্পষ্টত এর জন্য দরকার আমাদের কর্মপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এবং নেতৃত্বের মধ্যে উদ্ভাবনী দক্ষতা—বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কাজের সঠিক বিভাজন ও মেলবন্ধন করার মাধ্যমে।

মূল প্রশ্ন হল উৎপাদনের কেন্দ্র বা তাদের কর্মস্থলগুলোকে কাজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করার বদলে শ্রমিক মহল্লাগুলোকে বেছে নিতে হবে, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষও থাকেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, শিল্পভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বা এমনকি শিল্পস্তরে/কর্মক্ষেত্রে পার্টি গঠনের কাজকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে।

ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবাংলা, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লীর কিছু কিছু পকেটে আমরা আমাদের আকাঙ্খিত 'এলাকা'-র প্রাথমিক শর্তগুলো পূরণ করতে পেরেছি। এখন নয়া উত্তরণের লক্ষ্যে এলাকাগুলোতে যে বীজগুলো বপন করা হয়েছে সেগুলোকে পরিকল্পিতভাবে বিকশিত ও সংহত করার কাজ করতে হবে। আমরা এই সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকাগুলোকে বেছে নিতে পারি আমাদের প্রধান কাজের কেন্দ্র তথা গবেষণাগার হিসাবে যাতে আসন্ন এ আই সি সি টি ইউ-র জাতীয় সম্মেলনের প্রচারকে ত্বরান্বিত করা যায়।

আসুন, এই 'এলাকাগুলোকে' নীচের লক্ষ্য অনুযায়ী গড়ে তুলি—

বাস্তব সত্য হল, নতুন গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়নগুলো পুরাতন ট্রেড ইউনিয়নগুলোর থেকে বেশি প্রাণবন্ত। এখানে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রভাবিত ক্ষেত্রের বা সদস্য সংখ্যার তুলনায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং নেতৃত্বকারী শ্রমিকের সংখ্যার অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। মূল সমস্যা রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের লাগাতার প্রাণবন্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের উন্নতি করা, দেখাশোনা করা এবং ধরে রাখতে পারার মধ্যে। সচেতন এবং পরিকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে প্রাণসঞ্চার করা ও তাকে সংহত করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। এক নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্কৃতি এবং শ্রমিকদের সক্রিয় যোগদান এবং শ্রমিক অগ্রণীদের উদ্যোগী ভূমিকা এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু। দৈনন্দিন ট্রেড ইউনিয়ন কাজের এবং অফিস সংক্রান্ত কাজকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে নতুন চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করা যায় এবং এর সাথে যুক্ত করা যায় প্রচার, আলোড়ন এবং সংগঠনিক কাজের সৃজনশীল পথ।

শ্রমিকদের রাজনীতিকরণের প্রশ্নে আমরা পুরোনো এক অসঙ্গতির সম্মুখীন হচ্ছি। যেটা হল আমাদের ব্যাপক ট্রেড ইউনিয়ন প্রভাবিত ক্ষেত্রের তুলনায় রাজনৈতিক প্রচারের অপ্রতুলতা। এমনকি তামিলনাড়ুতে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কাজ তুলনামূলকভাবে খুবই সংগঠিত এবং বিকশিত হচ্ছে কিন্তু সেখানেও আমরা সর্বশেষ নির্বাচনে (শ্রমিক শ্রেণীর মহল্লায়) সবচেয়ে কম ভোটের মাত্রাও অতিক্রম করতে পারিনি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে আমরা শ্রমিকদের রাজনীতিকরণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে কোন উদ্যোগ নিচ্ছি না। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে অর্থনীতিবাদ, ভোগবাদ অথবা অরাজনীতিকরণের পরিমণ্ডল শেকড় গেঁড়ে রয়েছে, আমাদের প্রচেষ্টা তাকে দূর করে একটি গুণগত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়। আমাদের পর্যবেক্ষণের সারসংক্ষেপ হল ঃ

প্রথমত, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বিভিন্ন কেন্দ্র এবং বিভাগ থাকায় আমরাও আমাদের প্রভাবিত

করা না যায় তাহলে আমাদের এই অনুশীলন বঞ্চিত হবে বস্তুগত গতিময়তা থেকে নতুন নতুন শক্তিকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে। আসামেও যদি আমরা নতুন নতুন সেক্টরে অগ্রগতির মধ্য দিয়ে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করি, তাহলেও এই অগ্রগতি ভুলপথে চালিত হবে যদি না আমরা

নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকটি এলাকা গড়ে তোলার শর্ত আমরা পরিপক্ক করে তুলতে পারব।

ভবিষ্যতের এই দিশায় আমরা সংগঠিতভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে একটি বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র হিসাবে এ আই সি সি টি ইউ-র বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। - ডি পি বক্সী

রাজনৈতিক শ্রদ্ধাঞ্জলী

প্রয়াত কমরেড গুরশরণ সিং

শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভগৎ সিং-এর উত্তরাধিকারকে উর্ধ্বে তুলে ধরা, পাঞ্জাবের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও জনসাংস্কৃতিক মঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কমরেড গুরশরণ সিং গত ২৮ সেপ্টেম্বর (ঘটনাবশতঃ ভগৎ সিং-এর জন্মবার্ষিকীতে) চন্ডীগড়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ভগৎ সিং-ই ছিলেন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণার এবং তাঁর নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে তিনি শহীদ-ঈ-আজম-এর জীবন ও আদর্শকেই বরাবর প্রাণবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে ব্রতী ছিলেন।

কমরেড গুরশরণ সিং মাত্র ১৬ বছর বয়সে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন এবং সারা জীবন কমিউনিস্ট আদর্শে অবিচল থেকেছেন। তিনি কোনও রাজত্বের সাথে কখনই সমঝোতা করেননি, তাঁর নীতিগত অবস্থান থেকে তিনি এমনকি মুহূর্তের জন্যও কোনদিন বিরত হন নি। তিনি যখন পাঞ্জাব সরকারের সেচ বিভাগে গবেষক অফিসার হিসেবে কাজ করতেন তখন ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই সময়কাল থেকেই ১৯৫৬ সাল নাগাদ তিনি বিপ্লবী নাট্য পরিচালনার যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর কন্যা সহ পরিবারের সকল সদস্যরাই নাটকগুলোতে অংশ নিতেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তিনি সহস্রাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। খুবই কম রসদের ওপর নির্ভর করে তিনি নাটকগুলোতে প্রত্যেকটা বিষয়কে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিবেশন করতেন এবং সামন্ত অত্যাচার, পুঁজিবাদী লুণ্ঠন, নিপীড়ন, সাম্রাজ্যবাদ-এর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে পারতেন।

তিনি কোনদিনই নিজেকে পাঞ্জাবের মধ্যে গন্ডীবদ্ধ করে রাখেননি, ১৯৮৫ সালে জন সাংস্কৃতিক মঞ্চ গঠনের ক্ষেত্রে দুরন্ত ভূমিকা নিয়েছিলেন, যে সংগঠন মুখ্যত হিন্দী-উর্দু অঞ্চল কেন্দ্রীক গড়ে উঠেছে। তিনি কখনও নিজেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। তিনি পাঞ্জাবের লোক সভ্যাচার মঞ্চ এবং ইনকিলাবী মঞ্চ গঠনেও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, আর আই পি এফ-এর উপদেষ্টা পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। তিনি সি পি আই (এম এল)-এর একজন ঘনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন এবং সবসময়ই সমস্ত উদ্দীপনা নিয়েই পার্টির কর্মসূচীগুলোতে অংশ নিতেন। কমরেড গুরশরণ সিং-এর অন্তিম যাত্রায় প্রচুর সাধারণ মানুষ ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা সামিল হয়েছিলেন। প্রয়াণকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী ও দুই কন্যা সহ তাঁর সমগ্র বিপ্লবী উত্তরাধিকারকে। কমরেড গুরশরণ সিং লাল সেলাম!

ভ্রম সংশোধন

গত ২৯ সেপ্টেম্বর '১১ সংখ্যায় — (১) প্রথম পাতায় " সিঙ্গুরের ... জয়" শীর্ষক বিবৃতিতে "... রতন টাটাকে শিল্প গড়ার নামে যে ১০০ একর উর্বর চাষের জমি দিয়েছিল ..."-র জায়গায় পড়তে হবে "... প্রায় ১০০০ একর ...।" (২) সম্পাদকীয়র ৩৮ লাইনে পড়তে হবে "... তৃণমূল পরিচালিত কংগ্রেস জোটের সরকারে সদ্য আসার ভিত্তিতে ঘাসফুলের দল ...।" (৩) তৃতীয় পাতায় "নদীয়া জুট মিল ... লড়াই শুরু হয়েছে" শীর্ষক প্রতিবেদনে পড়তে হবে (ক) "বকেয়া পি এফ ২০০৫-এ ২৬ কোটি ২৯ লক্ষ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ...।" (খ) "ওয়ার্ল্ডার"-এর জায়গায় হবে "ওয়াইন্ডার"।

সমাজগণতান্ত্রিক আত্মসমর্পণ এবং সি পি আই (এম)-এর পতন
প্রভাত পট্টনায়কের লেখার জবাবে

।। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ।।

পশ্চিমবাংলায় একাদিক্রমে ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের বিপর্যয়কর পরাজয় দেশের বাম মহলে আবার নতুন করে বিতর্ক ও ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। শাসক শ্রেণীগুলো আর তার সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির সমস্ত বড় অবাম ধারা এই পরাজয়কে যথার্থ অর্থেই ভারতীয় বামেদের বিলুপ্তির শুরু বলে মনে করতেই পছন্দ করবে। বামেদের মধ্যেকার ও চারপাশের অধিকাংশ মানুষই অবশ্য সঠিকভাবেই এই বুর্জোয়া বিজয়োল্লাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা বলেছেন, পশ্চিমবাংলায় সি পি আই (এম)-এর বিপর্যয়কর পরাজয় তার নিজেরই সৃষ্টি। জনবিরোধী অবিমৃশ্যকারিতা, সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও ক্রমবর্ধমান দক্ষিণপন্থী প্রবণতার জন্য পশ্চিমবাংলায় ঐ দল ও তার সরকারকে যথাযথভাবেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সমস্ত প্রকৃত বাম শক্তিকে এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাম আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

পশ্চিমবাংলার বিপর্যয়ের কোন আন্তরিক পর্যালোচনা সি পি আই (এম) অবশ্য এখনও হাজির করেনি। আগামী বছরের গোড়ার দিকে যে পার্টি কংগ্রেস হওয়ার কথা তাতে এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের পর্যালোচনা কিভাবে করা হয় তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে, সি পি আই (এম) নেতৃত্ব এখনও পশ্চিমবাংলার এই বিপর্যয়কে পরপর সাতবার বিজয়ের পর নিছক একবারের পরাজয় বলে এর গুরুত্বকে খাটো করে দেখাতে চাইছেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, পশ্চিমবাংলায় সি পি আই (এম) যে পরিস্থিতির মুখোমুখি তা কিন্তু আদৌ 'স্বাভাবিক' নয়। এই প্রেক্ষাপটে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে অবশ্যই স্বাগত জানাব। এটা লক্ষণীয় যে, পট্টনায়ক ইংরাজি 'প্র্যাক্সিস' শব্দটি ব্যবহার করছেন (যা দিয়ে বোঝায় সচেতন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ অনুশীলন) যে শব্দটি তত্ত্ব ও অনুশীলনের আন্তসম্পর্কের অন্তর্গত। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়ার অভিযোগ অনুশীলন এবং তত্ত্ব উভয় দিক থেকেই বর্তায়।

পট্টনায়ক অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়ার চার ধরনের উদ্বেগজনক পরিণতির কথা বলেছেন। প্রথমত, এটিকে আত্মোন্নতিবাদ, আমলাতন্ত্রবাদ এবং কর্তাবাদ-এর মত ব্যাপকভাবে প্রকট ব্যাধিগুলোর (সেগুলো স্থানীয় স্তরে বলেই পট্টনায়ক বলছেন) পিছনের মূল কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, পার্টির নিজের শুদ্ধিকরণ অভিযানের আহ্বানে বা আত্মসমালোচনামূলক নোটে প্রায়শই যেগুলোর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পরিণতিটি হল, বিরাজমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা। এর ফলে, পার্টির স্বার্থকে বুনিয়াদি শ্রেণীর স্বার্থের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ও ভিন্নমুখী হিসাবে দেখার কারণে বুনিয়াদি শ্রেণীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। তৃতীয় পরিণতিটি হল, কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য (বুর্জোয়া) রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেকার ফারাককে কমিয়ে আনা। আর চতুর্থত এবং সবচেয়ে বুনিয়াদি দিক থেকেও বটে—অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়াটা আরও বেশি অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়ার দিকে ঠেলে দিতে চায় এবং তার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দলগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব কার্যত মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

পট্টনায়ক সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, "ঐ অবস্থায় কমিউনিস্টরা (ততদিনে তারা

সি পি আই (এম)-এর অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়ার উৎসটা কি? এর প্রথম কারণ হিসেবে পট্টনায়ক পশ্চিমবাংলার বাইরে সি পি আই (এম)-এর বিকাশরুদ্ধতার কথা বলছেন। এই বিকাশরুদ্ধতাই পার্টিকে শিল্পায়নের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় তার ক্ষমতাকে সংহত করতে মরিয়া করে তোলে, কিন্তু তা আত্মঘাতী হয়ে দেখা দেয়। পশ্চিমবাংলার কৃষকরা পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তার কারণে আবার অন্যান্য রাজ্যে পার্টির কর্পোরেট-বিরোধী কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষমতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায় এবং পার্টির বিকাশরুদ্ধতা আরও বেড়ে যায়। এই বিকাশরুদ্ধতাকে পট্টনায়ক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট প্রেক্ষাপটের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত করে তুলেছেন—সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন থেকে জন্ম নেওয়া নৈরাশ্য এবং চীনে বর্তমান যে পুঁজিবাদী সংস্কার চলছে সেই অভিজ্ঞতার নেতিবাচক প্রভাব। তিনি আমাদের আরও বলেছেন, কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অগ্রগতির পর কমিউনিস্টরা সবসময়েই দ্বিধাগ্রস্ততা দেখিয়েছে এবং সি পি আই (এম)ও 'কৃষি সংস্কারের পর কি' এই প্রশ্নের সঠিক মোকাবিলা করতে পারেনি।

সি পি আই (এম) কিভাবে অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়ার চাপকে প্রতিহত করতে পারে? পট্টনায়ক বলছেন, পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানোর প্রলোভন সি পি আই (এম)-কে পরিত্যাগ করতে হবে, কেননা "যে দল পুঁজিবাদের বিকাশে নেতৃত্ব দেয় তাদের পরিণতি গড়পড়তা বুর্জোয়া দলের থেকে আলাদা কিছু হবে না, বিপ্লবের প্রতি তার মৌখিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও।" অতএব, সি পি আই (এম)-এর

পট্টনায়ক আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে, কৃষি সংস্কার পরবর্তী এজেণ্ডাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার ব্যাপারে সি পি আই (এম) দ্বিধাগ্রস্ততা দেখিয়েছে। কিন্তু কৃষি সংস্কারের কর্মসূচীটির ক্ষেত্রেই বা কি দেখা গেছে? গোড়ার দিকে অপারেশন বর্গাকে 'চাষ করে যে—জমি তার' নীতিকে কালক্রমে বলবৎ করার দিকে একটা ধাপ বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু তা কখনই ঘটল না। যে অপারেশন বর্গা ছিল সমস্ত ভাগচাষীদের নথিভুক্ত করা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য চাষের অধিকার ও আইন দ্বারা নির্দিষ্ট ফসলের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার অভিযান, তাকেও মাঝপথে পরিত্যাগ করা হল। এর ফলে প্রজাস্বত্ব সংস্কার বিপরীতমুখী হয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হল। পশ্চিমবাংলায় বর্গা উচ্ছেদের যে খবর এখন পাওয়া যাচ্ছে তা আসলে শুরু হয়েছিল অনেক আগেই এবং পশ্চিমবাংলার মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত রিপোর্টে ২০০৪ সালেই বিষয়টিকে স্বীকার করে নিতে হয়। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা থেকে তথ্য উদ্ধৃত করে (চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা, ২০০৩, পৃঃ ৫৩ ও ৫৭) মানব উন্নয়ন ঐ রিপোর্টে পাট্টাদারদের জমি হারানো ও বর্গাদারদের উচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান প্রবণতাটিকে তুলে ধরা হয়। রাজ্যের কোথাও কোথাও যে ঐ হার গুরুতরভাবে বেশি তাও ঐ সমীক্ষায় দেখানো হয়।

এখন বোঝা যাচ্ছে যে, জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় যারা সিলিং-বহির্ভূত ও পুনর্বণ্টনযোগ্য অন্যান্য জমি দখল করেছিল, পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার তাদের জমির আইনি মালিকানা দিতে ব্যর্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রেই জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র স্থানীয় পার্টি নেতৃত্বের কব্জায় থেকে যায়

সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, পশ্চিমবাংলায় সি পি আই (এম) যে পরিস্থিতির মুখোমুখি তা কিন্তু আদৌ 'স্বাভাবিক' নয়। এই প্রেক্ষাপটে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলিতে লেখা প্রভাত পট্টনায়কের সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধ (পতনের মুখে বামেরা, ই পি ডব্লিউ, ১৬ জুলাই ২০১১) এক অভিপ্রেত ব্যতিক্রম হয়েই দেখা দিচ্ছে।

অধ্যাপক পট্টনায়ক সি পি আই (এম)-এর পরাজয়ের কারণ হিসাবে পার্টিকে সংকটগ্রস্ত করে তোলা এক দৃঢ়মূল প্রক্রিয়াকে দায়ী করেছেন। এই প্রক্রিয়াটিকে তিনি বলছেন 'অভিজ্ঞতাবাদ' যেটাকে তিনি পরাজয়ের চেয়েও আরও বেশি উদ্বেগজনক বলে মনে করেন। কেননা, পরাজয়ের ধারাকে পাল্টে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে অবিলম্বে পাল্টাতে না পারলে তা সি পি আই (এম)-কেই অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে। সি পি আই (এম)-এর ওপর তাঁর আস্থা অবশ্য অটুটই থাকছে—তিনি মনে করেন, সি পি আই (এম) ব্যর্থ হলেও তার স্থান নেবে এমন একটা কমিউনিস্ট সংগঠন যার তত্ত্বগত অবস্থান আজকের সি পি আই (এম)-এর সমগোত্রীয়, বলা যায়, সি পি আই (এম)-এরই এক মতাদর্শগত প্রতিচ্ছবি।

'অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়া' বলতে পট্টনায়ক কি বোঝাচ্ছেন? এই শব্দটির ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য পাঠককে অবশ্য একেবারেই অপেক্ষা করতে হবে না, কেননা তিনি তাঁর লেখা শুরু করেছেন এই নির্দিষ্ট অর্থবোধক বাক্যটি দিয়ে ঃ

"অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়া বা পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রকল্পের সঙ্গে সাযুজ্যহীন এক রাজনৈতিক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়াটাই ছিল পশ্চিমবাংলায় সি পি আই (এম)-এর পরাজয়ের চূড়ান্ত কারণ।" বিপ্লবী কমিউনিস্টরা সুবিধাবাদ বা সংশোধনবাদ-এর মত অধিকতর পরিচিত কমিউনিস্ট পরিভাষায় সি পি আই (এম)-এর তত্ত্ব ও অনুশীলনকে বর্ণনা করে আসছে। নিজের পছন্দের পরিভাষা ব্যবহার করে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে চাইলে আমরা পট্টনায়ককে পার্টি ও অন্যান্য দলগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব কার্যত মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

পট্টনায়ক সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, "ঐ অবস্থায় কমিউনিস্টরা (ততদিনে তারা নিজেদের অন্য যে নামেই ডাকুক না কেন) যদি নির্বাচনে জয়ী হয়ও এবং নিজেদের জোরে সরকার গঠন করেও তবু তাতে পুঁজিবাদকে অতিক্রম করা বা বুনিয়াদি শ্রেণীগুলোর অবস্থার পরিবর্তন করার বিন্দুমাত্র বস্তুগত কোন হেরফের হয় না।" অন্যভাবে বললে, অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়ার প্রক্রিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে তার কমিউনিস্ট সত্ত্বাটিকেই কেড়ে নিতে উদ্যত হয়। এক অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়া কমিউনিস্ট পার্টি যখনই বুনিয়াদি শ্রেণীগুলোকে এবং পুঁজিবাদকে অতিক্রম করার প্রকল্পটিকেই পরিত্যাগ করে এবং পুঁজিবাদের কর্তৃত্বের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে পুঁজিবাদকে 'সহনীয়' ও 'সহৃদয়' করে তুলতে শুধু কিছু বুর্জোয়া সংস্কারের জন্যে কাজ করে চলে, তখন তার কমিউনিস্ট সাইনবোর্ডটুকুই শুধু পড়ে থাকে।

প্রভাত পট্টনায়ক সি পি আই (এম)-এর কার্ডধারী সদস্য। এইরকম এক বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে আসা সি পি আই (এম)-এর এই ধরনের এক সমালোচনা অত্যন্ত কঠোর ও মতবিদ্বেষী বলে মনে হতে পারে। পট্টানায়ক অবশ্য দ্রুতই দু-একটি সাফাই যোগ করে তাঁর মতামতকে নমনীয় করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর পাঠকদের আশ্বস্ত করেছেন, সি পি আই (এম)-এর পরিস্থিতি এখনও তেমন শোচনীয় নয় এবং অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়ার মাত্রাটা নিয়েও শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এই সেদিনও পার্টি তার নিজের আশু স্বার্থকে বিপন্ন করেও ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির ইস্যুতে প্রথম ইউ পি এ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে নিজের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্বস্ততার প্রমাণ কি রাখেনি? পট্টনায়ক আমাদের আরও বলছেন, কেরলে সি পি আই (এম)-এর অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, সি পি আই (এম) অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে পড়ার বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারবে।

কেননা "যে দল পুঁজিবাদের বিকাশে নেতৃত্ব দেয় তাদের পরিণতি গড়পড়তা বুর্জোয়া দলের থেকে আলাদা কিছু হবে না, বিপ্লবের প্রতি তার মৌখিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও।" অতএব, সি পি আই (এম)-এর প্রতি তাঁর পরামর্শ ঃ "তাকে যেখানে সম্ভব সেখানেই সমসাময়িক জ্বলন্ত ইস্যুগুলো নিয়ে সংগ্রাম চালাতে হবে। সংগ্রামগুলো বাম নেতৃত্বাধীন সরকারগুলোকে অস্বস্তিতে ফেলতে বা তাদের বিপন্ন করে তুলতে পারে, তবু সেই সরকারগুলোকে রক্ষা করার অভিজ্ঞতাবাদ নির্দেশিত কৌশলকে প্রতিহত করেই তা চালাতে হবে। শুধু এটা করলেই হবে না, রাজ্য সরকারগুলোকে পরিচালিত করতে গিয়ে তাকে সর্বসামর্থ্য দিয়ে এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যে, বুনিয়াদি শ্রেণীগুলোর স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও তাদের বস্তুগত পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নতুন নতুন পথের উদ্ভাবনা যেন হতে থাকে, যার ফলে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়।"

এই পরামর্শকে একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দ আমাদের সবসময়েই বলে এসেছেন যে, পশ্চিমবাংলা হল ভারতের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের সবচেয়ে অগ্রণী ঘাঁটি এবং বামফ্রন্ট সরকারের নিরবিচ্ছিন্ন শাসন হল সর্বজনস্বীকৃত এই সত্যের অকাট্য প্রমাণ। অধ্যাপক পট্টনায়ক আমাদের যা বলছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আখ্যানের আভাস দিচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় সি পি আই (এম) পুঁজিবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে বুনিয়াদি শ্রেণীগুলোর স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও তাদের বস্তুগত পরিস্থিতিকে উন্নত করার পরিবর্তে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটাতে ও তার সরকারকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত থেকেছে। আর 'বুনিয়াদি শ্রেণীগুলোর দমন'-এর মধ্যে দিয়েই তো পুঁজিবাদের বিস্তার ঘটে—তাই সিঙ্গুরের নির্মম দমন ও নন্দীগ্রামের গণহত্যা যুক্তিসঙ্গতভাবেই ঘটল। এর সঙ্গে 'বাম-নেতৃত্বাধীন সরকারগুলোকে রক্ষা করার অভিজ্ঞতাবাদ-প্রসূত কৌশল' এটা সুনিশ্চিত করল যে, অসমর্থনীয় বিষয়কেও সমর্থন করতে গিয়ে সি পি আই (এম) বুদ্ধিজীবীরা যাতে নিজেদের চূড়ান্ত মাত্রায় কলঙ্কিত করে তোলে।

অন্যান্য জমি দখল করেছিল, পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার তাদের জমির আইনি মালিকানা দিতে ব্যর্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রেই জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র স্থানীয় পার্টি নেতৃত্বের কব্জায় থেকে যায় এবং নীচুতলার সাধারণ মানুষকে তাদের জমি ও মেয়াদিস্বত্বের নিরাপত্তার জন্য পার্টির ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এরাই হল সেইসমস্ত অসহায় মানুষ যারা আজ গ্রামীণ বাংলায় আবার নতুন করে আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছে, কেননা কায়েমি স্বার্থান্বেষীরা রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে তাদের হারানো জমি পুনর্দখলের চেষ্টা করছে। নতুন সরকার আসার সাথে সাথে কিছু নামজাদা 'ভূমি সংস্কার বিশেষজ্ঞ' যে উল্টো সুরে গাইতে শুরু করেছেন, সেটা এক ভিন্ন প্রসঙ্গ।

যে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবাই পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় ভূমি সংস্কার বিশেষজ্ঞ এবং অপারেশন বর্গার প্রশাসনিক রূপকার বলে মনে করে থাকেন, তিনি এক শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে দেখা দিচ্ছেন। পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৮০ সালে করা তাঁর সমীক্ষায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় দরিদ্রদের অবস্থা আরও করুণ হয়ে পড়া এবং মধ্যবিত্তদের হাতে ক্ষমতা সংহত হয়ে ওঠা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পশ্চিমবাংলা সরকারের কাছে ১৯৯৩ সালে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে সিলিং-বহির্ভূত দু-লক্ষ একরেরও বেশি জমি বিতরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং ২০০০ সালে গঠিত জমি সংস্কার ট্রাইবুনালও ঐ তথ্যটি অনুমোদন করে। এখন শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন সরকারের কাছে ভূমি নীতি সম্পর্কিত যে দলিল পেশ করেছেন তাতে কৃষক/ভাগচাষী/কৃষি শ্রমিকদের 'বেআইনি দখল' থেকে জমিকে মুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। আর এখন তিনি বলছেন, বামেদের নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলন নাকি বরাবরই এ ধরনের 'বেআইনি দখলদারি'-তে মদত জুগিয়েছে এবং এটাকে তিনি ভূমি সংস্কারের বিপরীতে 'জমি ডাকাতি' বলে আখ্যা দিয়েছেন!

(ক্রমশঃ)

নতুন ভূমি অধিগ্রহণ বিল ...

একের পাতার পর

রয়েছে কিংবা এই অধিগ্রহণের ফলে যে সব পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁদের জন্য ন্যায্য ও উচিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা এবং এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা এবং বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের সম্মিলিত ফলাফল যাতে এমন হয় যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা উন্নয়নের অংশীদার হয়ে ওঠে, সেটাকে সুনিশ্চিত করা, যার পরিণামে তাঁদের অধিগ্রহণ পরবর্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে।" 'মানবিক, অংশগ্রহণমূলক, আলোচনাভিত্তিক, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া', 'ন্যায্য ও উচিত ক্ষতিপূরণ', 'ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপন', 'ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের উন্নয়নের অংশীদার করা ও তাঁদের উন্নয়ন পরবর্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি' ইত্যাদি জনমোহিনী শব্দবন্ধগুলো দিয়ে বিলের প্রস্তাবনায় যে সমস্ত বিষয়গুলোকে মোটেই আড়াল করা যাচ্ছে না তা হল, জমি অধিগ্রহণ হবে 'শিল্পায়ন, শহরায়ন ও উন্নয়ন'-এর জন্য এবং সেই অধিগ্রহণ হবে 'বাধ্যতামূলক'। সুতরাং পুরনো "ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪"-এর মূল উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি এবং সংশোধিত বিলের মূল উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির মধ্যে কোন ফারাক নেই, শুধু তাতে কিছু উপশমকারী মলম দেওয়া হয়েছে মাত্র।

সংশ্লিষ্ট বিলটির ৩ নং ধারায় বিলে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দবন্ধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেখানে 'জনস্বার্থ' এই শব্দটির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, (জেড এ) (৬) ও (৭) উপধারায় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রকে হস্তান্তরের জন্য সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিও। সেই অধিগ্রহণ চলবে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন বা জনহিতকর কাজের জন্য 'পি পি পি' বা যৌথ উদ্যোগ এবং সম্পূর্ণ পাতা-ফল-কাঠ কুড়ানি, মৎসজীবী, জেলে, জঙ্গল-শিকারী ইত্যাদিরা ও তার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জমিতে তিন বছর আগে থেকে যারা বসবাস করছে, তারাও ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপনের আওতায় আসবে। কথাগুলো শুনতে ভাল, কিন্তু কায়েমী স্বার্থের চোখ রাঙ্গানিকে উপেক্ষা করে কিভাবে এইসব অন্তেবাসী মানুষরা বাস্তবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, তার কোন দিশা বিলে পাওয়া যায় না। ঠিক যেমনটা সিঙ্গুরে দেখা গেছে, অধিগ্রহণের ফলে বহু অ-নথিভুক্ত বর্গাদার ও খেতমজুর জীবিকাচ্যুত হয়েছে, কিন্তু কোন ধরনের নথির অভাবে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন বা পুনঃসংস্থাপনের দাবি তারা নথিভুক্ত করাতে পারেনি। ঠিক একই দশা হবে প্রস্তাবিত আইনবলে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও। এইসব মানুষদের আগে যথাযথভাবে নথিভুক্তকরণ প্রয়োজন, নইলে কোনদিনই এরা কোন আইনী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী হয়ে উঠতে পারবে না। বিল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরুত্তর।

জমির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, শুধু উপরিতলের জমি বা তার সাথে সংযুক্ত কোন কিছু। কিন্তু মাটির তলাকার সম্পদের কি হবে? অনেক আগে থেকেই সরকার জল, জঙ্গল ও খনির ওপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে, আর তার সুযোগেই অনায়াস লুণ্ঠনের জন্য অবলীলাক্রমে পাহাড়, জঙ্গল, সাগর, খনি, উপকূল অঞ্চল বেসরকারি কর্পোরেট ক্ষেত্রের হাতে তুলে দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে বেসরকারি কর্পোরেট পুঁজির কুনজর পড়েছে এইসব অঞ্চল, বিশেষ করে খনি অঞ্চলের ওপর। সেই পথ মসৃণ করতে সতর্ক সরকার বিলের জমির সংজ্ঞায় বিষয়টা স্পষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, এইসব জমি থেকে জীবিকা সংগ্রহের চিরন্তন ও প্রথাগত অধিকার এইসব অঞ্চলে বসবাসকারী অন্তেবাসী মানুষদের ওপরই বর্তায়, যার যুগ যুগ ধরে এইসব জমি ও অঞ্চলের সংরক্ষণ করেছে।

খাদ্য সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে বিলে বলা হয়েছে, একেবারে অনন্যোপায় না হলে বহুফসলী জমি অধিগ্রহণ করা হবে না এবং তাও সংশ্লিষ্ট জেলার ৫ শতাংশের বেশি সেচসেবিত বহুফসলী জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। যদি একান্তই বহুফসলী জমি অধিগ্রহণ করতে হয়, তাহলে সমপরিমাণ অকৃষিজমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কে বিচার করবে কোন জমি একফসলী আর কোন জমি বহুফসলী? প্রায়শঃই দেখা যায়, সরকারি খাতায় বহুফসলী জমিকে একফসলী হিসাবে দেখানো রয়েছে। সিঙ্গুরের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই হয়েছিল। যে সব জেলায় নীট চাষের জমির পরিমাণ জেলার ভৌগোলিক এলাকার অর্ধেকেরও কম, সেখানে সবমিলিয়ে মোট অধিগৃহীত জমি কখনই চষিত জমির ১০ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। সারা দেশে যেখানে আজ পর্যন্ত জমির রেকর্ডে চরম অব্যবস্থা ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে, সেখানে কোন জমির চরিত্র কি বা কোন জমিতে চাষ হয় না হয়, তার নথি কে রাখবে বা তা কিভাবে রক্ষিত হবে?

প্রস্তাবিত আইনের শেষে একটা তপশিল যুক্ত করা হবে, যাতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি দেওয়া থাকবে। জমির বাজারদর নির্ধারণ করা হবে সংশ্লিষ্ট এলাকা বা তার আশপাশের এলাকার গত তিন বছরে রেজিস্ট্রিকৃত জমির ৫০ শতাংশের গড় নিয়ে। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে বাজারদর ধরা হবে তার দ্বিগুণ। সেই জমির ওপর যদি কোন বাড়ি বা কাঠামো থাকে তবে সরকারি ভ্যালুয়ার তার দাম নির্ধারণ করবে। এই দুই দাম মিলিয়ে স্থির হবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ। ক্ষতিপূরণের ১০০ শতাংশ দেওয়া হবে সোলেসিয়াম বা জমিহারাদের জমি হারানোর বেদনার মলমস্বরূপ খেসারত হিসাবে। শহরায়নের জন্য জমি নিলে ডেভেলপ করা জমির ২০ শতাংশ সংক্ষিত করে রাখতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য। বেসরকারি সংস্থার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হলে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত নিজের শেয়ার হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে দিতে পারে।

পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপন প্যাকেজের মধ্যে আছে, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি পরিবারকে ১২ মাসের জন্য প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে অর্থ। এর সাথে থাকবে, প্রকল্পে যদি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় তবে প্রতি পরিবারের একজনকে বাধ্যতামূলকভাবে চাকরি অথবা তার বিনিময়ে পরিবারপিছু এককালীন ৫ লাখ টাকা কিংবা ২০ বছরের জন্য মাসিক ২,০০০ টাকা করে অ্যানুইটি। ঘরহারাদের ক্ষেত্রে জুটবে বিকল্প বাড়ি, যার ভিতের আয়তন কমপক্ষে ৫০ বর্গমিটার হতে হবে। সেচের জন্য জমি নেওয়া হলে কম্যাণ্ড এলাকায় এক একর জমি, পরিবহন খরচ বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং এককালীন পুনঃসংস্থাপন মঞ্জুরি বাবদ আরও ৫০,০০০ টাকা। তপশিলি জাতি-উপজাতিভুক্ত মানুষের জন্য রয়েছে অতিরিক্ত আরও কিছু সুবিধার প্রস্তাব। এই হল সমূলে ভিটে-মাটি-রুজি-রোজগার থেকে উৎখাত হওয়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মোট ক্ষতি নিরূপনের মানদণ্ড। কি ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হল এইসব মানদণ্ড, কি ভিত্তিতেই বা তা নিয়ে দরকষাকষি করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী, আর কি ভিত্তিতেই বা শেষমেশ সকলে মিলে একযোগে মাথা নাড়লেন বিলটির সপক্ষে, তা বোধগম্য হল

বাঁকুড়ায় কৃষিমজুর সমিতির জেলা সম্মেলন

দুর্নীতির ইস্যুতে যখন গোটা দেশ উত্তাল তখন গ্রামাঞ্চলের কায়েমী শক্তির লুঠতরাজের বিরুদ্ধে বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলেও ঐ লড়াই চলছে। গণসংগ্রামের সেই উত্তাপের মধ্য দিয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল কৃষিমজুর সমিতির বাঁকুড়া জেলা তৃতীয় সম্মেলন। ওন্দা হাইস্কুলে জাটুলাল হেমব্রম মঞ্চ ও সীমা নন্দী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের আলোচনায় উঠে এলো এলাকাভিত্তিক নানা স্থানীয় সংগ্রামের বার্তা—

হস্তান্তরের জন্য সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিও। সেই অধিগ্রহণ চলবে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন বা জনহিতকর কাজের জন্য 'পি পি পি' বা যৌথ উদ্যোগ এবং সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে। এই উপধারাটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা সম্ভব যে, বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য যে কোন অধিগ্রহণকেই বেমালুম জনহিতকর বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তার ওপরে সেখানে এও বলা হয়েছে যে, বেসরকারি মালিকদের জন্য এই ধরনের অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে আগে থেকে জানিয়ে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অন্ততপক্ষে ৮০ শতাংশের সম্মতি মালিককে সংগ্রহ করতে হবে। কিভাবে সংগ্রহ হবে এই সম্মতি, কারা করবে—এসবই পুরো ধোঁয়াশাময়, আর এই ধোঁয়াশার ফাঁক দিয়েই অনায়াসে চলতে পারে জবরদস্তি অধিগ্রহণ।

এত ঢাকঢোল পিটিয়ে 'ভূমি অধিগ্রহণ'-এর সাথে 'পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপন'-এর বিষয়টিকেও সংযুক্ত করে এক সংযুক্ত বিল তৈরি করা হল, অথচ বেসরকারি মালিকরা শিল্পের জন্য যদি শহরে ৫০ একরের কম এবং গ্রামাঞ্চলে ১০০ একরের কম জমি কেনে, তাহলে এই বিলে প্রস্তাবিত 'ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপন'-এর দায় তাদের থাকবে না। বিলের এই জায়গাটা বিরাট একটা ফোকর যার ভেতর দিয়ে গলে যেতে পারে পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপন না দিয়েই হাজার হাজার একর জমির অধিগ্রহণ। বস্তুত, এই বিলকে কাজে লাগিয়ে পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা না করেই যে কোন পরিমাণ জমি বেসরকারি মালিকরা কিনে নিতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তালিকায় জীবিকা হারানো মানুষদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে অধিগ্রহণের তিন বছরে আগে থেকে যে সব কৃষিমজুর, বর্গাদার বা প্রজা পরিবারের জীবিকা 'প্রাথমিকভাবে' সংশ্লিষ্ট জমির ওপর নির্ভরশীল ছিল, তারা ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপনের সুবিধা পাবে। তারা ছাড়াও, জলাভূমি, বনভূমি ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল

দুর্নীতির ইস্যুতে যখন গোটা দেশ উত্তাল তখন গ্রামাঞ্চলের কায়েমী শক্তির লুঠতরাজের বিরুদ্ধে বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলেও ঐ লড়াই চলছে। গণসংগ্রামের সেই উত্তাপের মধ্য দিয়ে গত ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল কৃষিমজুর সমিতির বাঁকুড়া জেলা তৃতীয় সম্মেলন। ওন্দা হাইস্কুলে জাটুলাল হেমব্রম মঞ্চ ও সীমা নন্দী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের আলোচনায় উঠে এলো এলাকাভিত্তিক নানা স্থানীয় সংগ্রামের বার্তা—আরও বড় পরিধিতে তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার। যথা, দক্ষিণ বাঁকুড়ার হীড়বাঁধ ব্লকের কুন্তলা সর্দার বললেন, কিভাবে ১০০ দিনের কাজের মজুরি থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র মহিলারাই দলবদ্ধ ভাবে লড়াই করে তা আদায় করেছেন। এ জন্য গ্রামে গ্রামে মহিলাদের মধ্যে প্রস্তুতিমূলক সভা করা, পরবর্তীতে পঞ্চায়েত ঘেরাও-পুলিশের সাথে মোকাবিলা—এসব কিছুই মহিলারা স্বাধীন উদ্যোগে করেছেন। ওন্দা ব্লকের মথুর লোহার, জবর লোহাররা তুলে ধরলেন ১০০ দিনের কাজে ড্রোজার ব্যবহার করে টাকা সরিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা করেছিল তৃণমূলের পঞ্চায়েত কর্তারা। ঐ গ্রামে সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল থাকলেও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে কৃষিমজুরদের মধ্যে প্রচারের ঝড় তুলে, ব্লক অফিস থেকে কাজের হিসাব নিকাশের তথ্য সংগ্রহ করে তা ব্যাপক মানুষের মধ্যে প্রচার করে। হুমকি-ভীতি প্রদর্শনকে জঙ্গী মেজাজে মোকাবিলা করে ঐ অপচেষ্টা রুখে দেওয়া গেছে। ইন্দপুর ব্লকের রাজকুমার বাউরি, লক্ষীকান্ত সর্দার, মুটুক বাউরিরা বললেন যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর গরিবদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের হামলা শুরু হয়েছে। গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা বর্তমানে জামা পাল্টে তৃণমূলে ভিড়েছে। এখানেও সি পি এমের মধ্যে থাকা কৃষিমজুরদের মজুরির দাবিতে আমরা বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করি এবং তাতে সাফল্য পাওয়া যায়। সংগ্রামী বামপন্থার পতাকাতলে সমাবেশিত হওয়ার 'অপরাধে' একটি সংসদের গরিবদের স্পেশাল জি আর এ-র চাল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ নিয়ে ব্লকে ডেপুটেশন দিয়ে চাল বিলির আদেশ সত্ত্বেও পঞ্চায়েত তা কার্যকরি করছে না। মশিয়ারা অঞ্চলের পীযুষ মাণ্ডি বললেন, রাস্তার কাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আদিবাসী মহিলাদের সাহসী প্রতিরোধের কথা ইত্যাদি।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৮৫ জন প্রতিনিধি, ১০ হাজার কৃষিমজুর গণসদস্য সংগৃহীত হয়েছে। শুরুতে জেলা সভাপতি বাবলু ব্যানার্জী তুলে ধরেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে জেলার যে কৃষিমজুররা মূলত বামপন্থার পতাকাতলে আছেন তারা খানিকটা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছেন, কারণ সরকারি বামপন্থীরা ক্ষমতাচ্যুত ও জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে গরিব মানুষদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। এই অবস্থায় সমস্ত গরিব মানুষদের পাড়ায় পাড়ায় আমাদের পৌঁছতে হবে এবং তৃণমূলের গরিব মানুষকে উপেক্ষা করার নীতির বিরুদ্ধে মৌলিক ইস্যুগুলো ধরে আন্দোলনমুখী উদ্যোগ নিতে হবে। বিগত দিনে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে দুটি জায়গায় প্রশাসনকে চাপ দিয়ে মামলা দায়ের করানো গেছে। রাজ্য পর্যবেক্ষক সজল অধিকারী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেন যে, তৃণমূল যে প্রতিশ্রুতিগুলো সামনে রেখে ক্ষমতায় এসেছে তার ধারপাশ দিয়ে সে হাটছে না। ফলে বামফ্রন্ট জমানায় যে দাবিগুলো নিয়ে কৃষিমজুররা লড়াই করেছে সেগুলোকেই এখন নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়া জেলায় কর্মরত পার্টি সংগঠক জয়তু দেশমুখ। তিনি বলেন, কৃষিমজুরদের স্বাধীন শ্রেণী হিসাবে সাংগঠনিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। সম্মেলন পরিচালনাকারী সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অজিত দাস ও অমল বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন, পরিশেষে ৩৫ জনের জেলা কাউন্সিল ও ১১ জনের জেলা কার্যকরি কমিটি এবং উপরোক্ত দুইজন সহ দীনবন্ধু মাল জেলা সম্পাদক এবং বাবলু ব্যানার্জী সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। আগামী কর্মসূচী হিসাবে একপ্রস্থ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয় গৃহীত হয়।

শেষে এক দৃপ্ত মিছিল ওন্দা গঞ্জ পরিক্রমা করে ওন্দা বাসস্ট্যাণ্ডে এক জনসভায় পরিণত হয়। জনসভায় বক্তব্য রাখেন হরেকৃষ্ণ কোঙার স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলার বামপন্থী ব্যক্তিত্ব অশনি মজুমদার। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থী শক্তিগুলোর সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও পার্টি ও গণসংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এইসব মানদণ্ড, কি ভিত্তিতেই বা তা নিয়ে দরকষাকষি করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী, আর কি ভিত্তিতেই বা শেষমেশ সকলে মিলে একযোগে মাথা নাড়লেন বিলটির সপক্ষে, তা বোধগম্য হল না। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের মনোহরণের জন্য পুনর্বাসনের অঞ্চলে স্কুল, হাসপাতাল, পানীয় জল, রাস্তা, বিদ্যুত, পোস্ট অফিস, রেশন দোকান, পঞ্চায়েত ইত্যাদি সবপেয়েছির দেশের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সারা দেশে এইসব পরিষেবার যা হাল, তা দেখে কি এই নয়া উপনিবেশে এক স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কেউ দেখবে?

বিলে পেসা আইন, ১৯৯৬ বা বনভূমি অধিকার আইন, ২০০৬ অথবা ৫ম তপশিলের অন্তর্গত (আদিবাসী অধ্যুষিত) এলাকায় ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কিত বর্তমান আইনগুলি সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আদিবাসী বা বনবাসী অধ্যুষিত বেশিরভাগ রাজ্যেই এই আইনগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে না। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও আছে। ওড়িশায় তো বনভূমি অধিকার আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আদিবাসীদের ভিটেছাড়া, রুজিহারা করে তাদের জমি পস্কো কোম্পানির হাতে তুলে দিতে মরীয়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার।

আসলে সংকট জর্জরিত পুঁজির কাছে জল-জমি-খনি-উপকূল-জঙ্গল হয়ে উঠেছে আদর্শ মৃগয়ার সর্বশেষ চাঁদমারি। বিশ্বজুড়ে চলছে নাছোড় মন্দা ও আর্থিক সংকট। ২০০৮-এ যে সংকটের বহিঃপ্রকাশ, আজ তা আরও গভীরতর। এই পরিস্থিতিতে যে কোন মূল্যেই হোক জমি হস্তগত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে কর্পোরেট ক্ষেত্র ও তার বশংবদ সরকারগুলো। প্রস্তাবিত বিলের ছত্রে ছত্রে তারই প্রতিচ্ছবি। বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ চলছে, চলবে। তাই তার বিরুদ্ধে কৃষক-আদিবাসীদের প্রতিরোধ আন্দোলনও চলছে এবং চলবেও। দাবি তুলতে হবে, এই বিল ও তার সাথে সাথে ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনটিকেই সমূলে বাতিল করতে হবে।

- সুকান্ত মণ্ডল

ওবামার দেশে প্রতিবাদের দামামা

মার্কিন মুলুকের বড়ো শহরগুলো এখন অনেকটাই কলকাতা বা দিল্লীর অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। যে দেশটাতে প্রতিবাদ বলতে বোঝাতো কোনো দপ্তরের সামনে ১০-১৫ জনকে নিয়ে দণ্ডী কাটার মতো চক্কর খেয়ে ঘোরা আর গাড়ি করে যাতায়াত করা সাধারণ মানুষের বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গাড়ির হর্ণ শোনা, সেখানে এখন প্রায়ই হাজার মানুষের মিছিল, পথ অবরোধ, দপ্তর ঘেরাও, দিনের পর দিন অবস্থান ও অবরোধ সংগঠিত হচ্ছে। মানুষ এখন পথে নেমে পড়েছে। প্রতিবাদ ছাড়া একটি পক্ষকালও কাটছে না। এই সেদিনই তো বিশ্বের সবচেয়ে ফাটকা বাজারকে কার্যত দখল-অবরোধ করে থাকল সাধারণ মানুষ প্রায় মাসাধিককাল। বড় বড় কর্পোরেট হনুরা বেশ বেকায়দায় এবং চিন্তিত। শহরের বিখ্যাত পার্কগুলো এখন মানুষের প্রতিবাদের আওয়াজে মুখর। প্রায়ই পুলিশ কোথাও ৭০০ কোথাও ১০০০ বা এমনকি ২০০০-এর ওপর মানুষকে গ্রেপ্তার করে ফাটকে পুরেছে। অনেককে আবার দিনের পর দিন জেল হেফাজতে রাখা হয়েছে। সাধারণ মার্কিনীরা এখন জীবন-জীবিকার লড়াইয়ে পিষ্ট হয়ে রাস্তাকেই একমাত্র রাস্তা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। বলা হচ্ছে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতার দিনগুলোকেও ছাড়িয়ে গেছে বর্তমান মার্কিন প্রতিরোধ আন্দোলন।

মানুষ পথে নেমেছে সেই বারাক ওবামার আমলে যার সমর্থনে একদিন লাখে লাখে মানুষ পথে নেমেছিল। আজ সেখানে জনসমীক্ষায় বোঝা যাচ্ছে তার সমর্থন নাকি ৩০ শতাংশেরও নীচে। বাবা বুশ বা ব্যাটা বুশেরও এত সঙ্গীন অবস্থা হয়নি। কি অদ্ভুত উল্টেপাল্টে যাওয়া। আজকে মার্কিনীরা বুঝতে শিখছে শাসক বদলালেও শোষণের রূপ বদলায় না। জনসমীক্ষা মার্কিন মুলুকে একটা পণ্য, যা কেনা যায়, বরাত দিয়ে বানানো যায়, মাজাঘষা যায়, কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও বারাক সাহেবকে কেউ জিতিয়ে রাখতে পারছে না, কি বিড়ম্বনা!

ওবামার দ্বিতীয় বিড়ম্বনা তার নির্বাচনের সময়কার বিপুল জনসমর্থন। রেকর্ড জনসমর্থন মার্কিন মুলুকের মানুষের মুক্তি। পরপর ১২ বছর প্রথমে বাবা বুশ ও তারপরে ব্যাটা বুশের পাল্লায় পড়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। মার্কিন মুলুকে মধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশী, কিন্তু তাঁদেরও ফাটকা পুঁজি বা ফাটকা ব্যবসার ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল। মার্কিন মুলুকে যে কোনো চাকরিরত ব্যক্তিরই আয়ের একটি অংশ শেয়ার

বাজারে খাটে—সে এক প্রকল্প, যাকে বলা হত ৪০১ স্কীম। আবার তাঁদের মাইনের একটা অংশ বেসরকারি মালিক কেটে নিত নিজের কোম্পানীতে পুনর্বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে। এক দীর্ঘ মন্দার ফলে এইসব প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ে, মানুষ আবিষ্কার করল যে ভাঁওতাবাজি দিয়ে তাঁদের অর্জিত টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে এবং শেয়ার না, কারণ শুধু জনতোষণী বাকচাতুর্যে চিড়ে ভেজে না, ওবামার ছিল চমকপ্রদ কথা, অথচ কোনো মৌলিক পরিকল্পনার প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল না।

ওবামার তৃতীয় বিড়ম্বনা হয়েছে তার পেছনে শ্রেণীর মানুষের ব্যাপক সমর্থন। ওবামা কখনই শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী আন্দোলনের প্রতিনিধি ছিলেন না, অথচ নিজেদের জীবন-জীবিকা রক্ষার তাগিদে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমজীবীরা, দূরবর্তী গ্রামগুলোর হতাশ কৃষকরা, বাজারের ধাক্কায় কম মজুরি পাওয়া শহরের কর্মীবাহিনী ও একেবারে বেকার, দরিদ্র মানুষরা জড়ো হয়েছিল এবং রীতিমতো রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়েছিল। এই সক্রিয়তা যখন কোন ব্যক্তি ক্যারিশমাধারী মানুষের পেছনে জড়ো হয় তখন বিপত্তি ছাড়া অন্যকিছু আসে না, অভাবে এবং সংগঠিত সর্বহারার প্রতিনিধিত্বকারী শক্তির বাইরে জন্ম নিতে পারে না। অথচ এই প্রত্যাশা কখনই কোনো ব্যক্তি নেতৃত্বের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব নয়—এই বিড়ম্বনা হয়তো আমরা আমাদের রাজ্যে "পরিবর্তনের" ঢেউয়ের মধ্যেও খুঁজে পেতে চলেছি। ব্যক্তি বিশেষের নেতৃত্ব কখনো শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সাকার করতে পারেনি, শুধু তাই নয় তা সবসময়ই মোহভঙ্গকে একটা শক্তিশালী অভ্যুত্থানের রূপ দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক এটাই হয়েছে, আজকে ফ্রান্সে এবং ইতালি ও অন্যত্রই এটা ঘটছে।

মার্কিন অর্থনীতির নিজস্ব কিছু বিড়ম্বনা আছে ঃ পরিষেবাকে পণ্যায়িত করে সেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে, যার ফলে তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদরা উৎপাদনকে ব্রাত্য করে শুধু টাকা-পয়সা বিতরণ করে এবং আর্থিক নীতি (মনিটারি ও রাজস্ব নীতি) দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাজাতে চেয়েছেন। সেই পদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি মন্দার চোটে একেবারে জেরবার হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ ভেবেছিল যে সারা পৃথিবী থেকে সস্তার উৎপাদনকে দেশের বাজারগুলোতে ফেলতে পারলেই দেশের জয়ের তরী তরতর করে বয়ে যাবে ... হল না, হওয়ার কথাও নয়। বুর্জোয়া অর্থনীতি উৎপাদনকে কম গুরুত্ব দিয়ে বা আরও বিশেষ করে বলতে গেলে "প্রয়োজনীয় উৎপাদন"-কে সরিয়ে দিয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রচুর উৎপাদনকে গণউৎপাদনের মাধ্যমে ছাপিয়ে দিলে উৎপাদনের কাঠামো এবং পরবর্তী পর্যায়ে তার বিকাশের জন্য যে নিরন্তর উৎসের দরকার হয় তার অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। ওবামার যুগে মার্কিন অর্থনীতি এখন বুশের আমল থেকে অনেক সঙ্গীন অবস্থায়। আর শ্রেণী মানুষের মোহভঙ্গ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তাদের কাছে সম্পদ বা উৎপাদনের সুলভতার অভাব থেকে, আর তাই হু হু করে বেড়ে উঠেছে অসমতা, সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে অসমতা অর্থাৎ শ্রেণী বিভাজন।

মানুষ তাই আজ পথে, তারা তাই এই অর্থনীতির ঘুঘুর বাসা ওয়াল স্ট্রীটকে ঘিরে রেখেছে, তাঁবু খাটিয়ে বসে আছে নিউইয়র্কের মুল কেন্দ্রে ... চলেছে

কিছু সত্ত্বেও বারাক সাহেবকে কেউ জিতিয়ে রাখতে পারছে না, কি বিড়ম্বনা!

ওবামার দ্বিতীয় বিড়ম্বনা তার নির্বাচনের সময়কার বিপুল জনসমর্থন। রেকর্ড জনসমর্থন ইতিহাসের নিরীখে সবসময়ের সমূহ ধ্বংস ডেকে আনে খুব তাড়াতাড়িই। কারণ ব্যাপক প্রত্যাশা থেকে মোহভঙ্গ ঘটে। ওবামার শ্রেণী নির্বিশেষে জনসমর্থনের পেছনে ছিল এক বদ্ধ অবস্থা থেকে পুনর্বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে। এক দীর্ঘ মন্দার ফলে এইসব প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ে, মানুষ আবিষ্কার করল যে ভাঁওতাবাজি দিয়ে তাঁদের অর্জিত টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে এবং শেয়ার বাজারে যে লগ্নি করা হয়েছে সেটা জলে ভেসে গেছে। মার্কিন জনসাধারণ এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওবামার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। ওবামা এসে কিছুই করতে পারলেন মানুষরা জড়ো হয়েছিল এবং রীতিমতো রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়েছিল। এই সক্রিয়তা যখন কোন ব্যক্তি ক্যারিশমাধারী মানুষের পেছনে জড়ো হয় তখন বিপত্তি ছাড়া অন্যকিছু আসে না, কারণ ব্যক্তি প্রতিভা সমাজ বা ব্যবস্থাকে বদলায় না অথচ মানুষের দিক থেকে সেই চাহিদা বা প্রত্যাশা কিন্তু থাকে। এই প্রত্যাশার পেছনে যে অসচেতনতা কাজ করে সেটা সংগঠিত শ্রেণী আন্দোলনের বণ্টনের ক্ষেত্রে অসমতা অর্থাৎ শ্রেণী বিভাজন।

মানুষ তাই আজ পথে, তারা তাই এই অর্থনীতির ঘুঘুর বাসা ওয়াল স্ট্রীটকে ঘিরে রেখেছে, তাঁবু খাটিয়ে বসে আছে নিউইয়র্কের মুল কেন্দ্রে ... চলেছে মানুষের প্রতিরোধ ... এই প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার প্রক্রিয়াতেই হয়তো দীর্ঘস্থায়ী মন্দাকে রোখার শর্ত সৃষ্টি করতে পারবে।

- সৌমিত্র বসু

মারুতি শ্রমিকদের লড়াই অব্যাহত

৩৩ দিন ধরে চলা লকআউট উঠে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মানেসারের মারুতি কারখানার শ্রমিকরা আরেকবার প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। ৭ অক্টোবর থেকে কারখানার ২০০০ স্থায়ী, অস্থায়ী ও শিক্ষানবীশ কর্মীরা স্ট্রাইক ঘোষণা করে কারখানার মধ্যেই ধর্ণায় বসেছেন। ধর্ণারত শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে মারুতি সুজুকির আরো দুটি কারখানা (সুজুকি পাওয়ারট্রেন ও সুজুকি মোটর সাইকেল)-এর শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেছেন। মানেসারের আরো কিছু কারখানায় শ্রমিকদের ধর্মঘটের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। ১ অক্টোবর যখন শ্রমিকরা মালিকদের পক্ষে ঝুঁকে থাকা চুক্তিপত্রে সই করতে বাধ্য হয় তখন থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে শ্রমিকদের মালিকের পক্ষ থেকে নেমে আসা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মারুতি মালিকদের চরিত্র ১ তারিখের পরের দিন থেকেই স্পষ্ট হতে থাকে যখন তারা লকআউটের সময় যাঁরা কাজ করছিলেন সেই অস্থায়ী কর্মীদের পুনর্বহাল করতে অস্বীকার করেন। ৭ অক্টোবর রাজ্য শ্রম দপ্তরের আদেশ অনুসারে তাঁরা অস্থায়ী কর্মীদের ফিরিয়ে নিতে রাজী হলেও পরের দিন অস্থায়ী কর্মীদের কারখানায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। তখন শ্রমিকরা কারখানার বাইরে ধর্ণা অবস্থান শুরু করেন। কর্তৃপক্ষ স্থায়ী কর্মীদের প্রতিও নানা দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন, তাঁদের কারখানার বিভিন্ন জায়গায় এমন কাজে বদলি করা শুরু হয় যে কাজে তাদের প্রশিক্ষণ নেই। এবং যখন তার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করে তখন তাঁদের হুমকি দেওয়া হয় যে তাঁরা কাজে 'ধীরে চলো' নীতি নিয়েছেন। উল্লেখ্য, কর্মীরা যে 'গুড কণ্ডাক্ট' বণ্ডে সই করেছেন, তাতে লেখা আছে যে কর্মীরা 'ধীরে চলো' নীতি নিলে তাদের বরখাস্ত করা হবে। যে ৪৪ জন স্থায়ী কর্মী এখনো বরখাস্ত হয়ে আছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ আনা হয়েছিল। শ্রমিকদের আরো হেনস্থা করার জন্য ৩ তারিখ থেকে কারখানার নিজস্ব বাস-সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হয়; যার ফলে তাঁদের কারখানায় পৌঁছতে দেরী হয়ে যাচ্ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুজুকি কারখানার মালিকদের সার্ভিস রুল অনুসারে কয়েক মিনিট দেরীর জন্যও ১৫০০ টাকা মাইনে কেটে নেওয়া হয়।

অস্থায়ী কর্মীদের প্রতি মালিকদের ব্যবহার দেখে স্থায়ী কর্মীরাও বুঝতে পারেন যে কর্তৃপক্ষ তাঁদের ওপরেও আঘাত নামিয়ে আনবেন। তাই তাঁরা ধর্মঘটের পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কর্মীদের নিজস্ব ইউনিয়ন মেসুর সম্পাদক সোনু গুজ্জর বলেন, যেহেতু মারুতি কর্তৃপক্ষ প্রথমে চুক্তি ভঙ্গ করেছেন তাই তাঁরা ১ তারিখের চুক্তি আর মানছেন না। চারটি মূল দাবিতে এই ধর্মঘট চলছে—সমস্ত অস্থায়ী কর্মীদের পুনর্বহাল করতে হবে, ৪৪ জন বরখাস্ত কর্মীদের ফিরিয়ে নিতে হবে, বাস সার্ভিস আবার চালু করতে হবে এবং স্থায়ী কর্মীদের কারখানার বিভিন্ন জায়গায় হঠাৎ করে বদলি করা চলবে না। শ্রম দপ্তর মারুতি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বললেও মালিকরা নিজেদের দাবিতে অনড়, অন্যদিকে হরিয়ানা সরকারও শ্রমিকদের হুমকি দেওয়া শুরু করেছেন। বিভিন্ন বাজারি পত্রিকাতেও মালিকদের কথা তোতাপাখির মত আউড়ে কর্মীরা হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে, এমন কথা বলা শুরু হয়েছে। মারুতি কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বলপূর্বক উচ্ছেদের জন্য হরিয়ানা সরকারের কাছে দাবি তুলেছেন সম্প্রতি। যখন কর্তৃপক্ষ হিংসার কথা বলছেন তখন মালিকদের পোষা শ্রমিক সরবরাহকারী সংস্থা তিরুপতি লিমিটেডের পক্ষ থেকে মানেসারের কারখানার প্রতি সংহতি জ্ঞাপনকারী সুজুকি মোটর সাইকেল প্ল্যান্টের কর্মীদের ওপর গত রবিবার গুলি চলে।

সামনের দিনে মারুতি কারখানার লড়াই আরো জোরদার হতে চলেছে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর আঘাত নেমে আসছে সারা দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ওপরেই এবং ব্যাপক হারে তাঁদের অস্থায়ীকরণ চলছে। শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন আত্মঘোষণাই পারে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। মারুতির শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রতি দেশব্যাপী সংহতি আন্দোলনই এখন সময়ের দাবি। - পর্যবেক্ষক

উড়িষ্যায় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে আইসা-র জয়

উড়িষ্যার গুণুপুর কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন (আইসা) প্রার্থীরা চারটি পদে জয়লাভ করেছেন। উড়িষ্যাতে এটাই আইসার প্রথম নির্বাচনী সাফল্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুণুপুর হল প্রয়াত বিশিষ্ট সি পি আই (এম এল) নেতা কমরেড নাগভূষণ পটনায়কের নিজের শহর।

আইসা প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন—সংসদের সভাপতি পদে বিশ্বনাথ দংশী, সাধারণ সম্পাদক পদে জগন্নাথ পাণীগ্রাহী, নাটক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে দীপক পটনায়ক ও রেগুলা বিনোদ। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর আইসা সদস্যরা বিজয় মিছিল সংগঠিত করেন। এখন আইসা সংকল্প গ্রহণ করছে সারা উড়িষ্যা জুড়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং ছড়িয়ে দিতে হবে। উড়িষ্যায় আইসা তার সদস্যদের ছাত্র ইস্যু ছাড়াও জনগণের পস্কো-বিরোধী আন্দোলনেও সমর্থনে-সমাবেশে সংগঠিত করেছিল।

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত

সি পি আই (এম-এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা - ৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹- ২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com